দাম : দশ টাকা

# স্বস্তিকা

লুটের রাজনীতি না হলে নোট বাতিলের প্রয়োজন হোত না

পৃঃ - ১২

মধ্যসাম্রাজ্যের মস্তানি

পৃঃ - ১৬

৬৯ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা।। ১২ ডিসেম্বর ২০১৬।। ২৬ অগ্রহায়ণ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

## চীনের দাদাগিরি

## উদ্বিগ্ন ভারত

# স্বস্তিকা

*।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৬৯ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১২ ডিসেম্বর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com


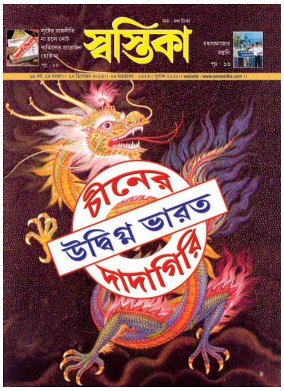



**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**



দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩



**দাম : ১০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

**Postal Registration No.-**

R N I No. 5257/57



দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com



স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।


ফঃ ১

# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

দিদি দিল্লী, পাটনা ঘুরে যতই নাটক করুন না কেন হালে পানি পাচ্ছেন না □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : দিদি সত্যি গরিবদরদি, মোদীজী প্লিজ চিঠিটা পড়ুন □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

লুটের রাজনীতি না হলে নোট বাতিলের প্রয়োজন হোত না □ সাধন কুমার পাল □ ১২

ভারতীয় অর্থনীতিতে নীরব ঘাতক চীন □ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ১৪

মধ্যসাম্রাজ্যের মস্তানি □ প্রবাল চক্রবর্তী □ ১৬

লিঙ্গ উপাসক আফগানিস্তান □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ২১

শ্রীচৈতন্য পরিকর শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু □ জনৈক ভক্ত □ ২৩

কালোটাকাকে গরিব জনতার টাকায় পরিণত করার সুযোগ প্রধানমন্ত্রীর নাগালে □ স্বামীনাথন আইয়ার □ ২৭

কাশ্মীর সমস্যার প্রেক্ষাপট বিশ্বকে জানানো প্রয়োজন □ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ২৯

নোট বাতিল : শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্নপূরণ □ বরুণ মণ্ডল □ ৩১

জাতীয় সঙ্গীত আর বাথরুম সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য কী সুপ্রিম কোর্ট বুঝিয়ে দিল □ ৩২


নিয়মিত বিভাগ


চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অঙ্গনা : ২৬ □ অন্যরকম : ৩৩ □ সুস্বাস্থ্য: ৩৫-৩৬ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮□ খেলা : ৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০ □ চিত্রকথা : ৪১ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৯ ডিসে. '১৬

প্রকাশিত হবে ১৯ ডিসে. '১৬

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## পশ্চিমবঙ্গে শিশু -বাজার

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন নোট বাতিল, 'বিমানে হত্যা' ও 'সেনা মোতায়েন' করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে'র বিরুদ্ধে সোচ্চার, তখন তাঁরই রাজ্যে বিভিন্ন নার্সিং হোম শিশু কেনাবেচার এক বাজারে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হোমগুলির মালিক, চিকিৎসক, নার্স, আয়া চক্রের এমন অমানবিক মুখ দেখে রাজ্যের মানুষ আতঙ্কিত। এই প্রসঙ্গেই এবারে লিখেছেন গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

**বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী**

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।*

*মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

**সানরাইজ ®**

**সর্ষে পাউডার**

SUNRISE PURE ®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## ছিঃ ! লজ্জা-শরম কিছু নাই

একটির পর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতি যখন মেঠো-রাজনীতি হইয়া দাঁড়ায়, তখন শেষপর্যন্ত তাহা কোথায় গিয়া পৌঁছাইবে বলা কঠিন। এইরকম রাজনীতিরই এক উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। নোট বাতিলের প্রসঙ্গটি লইয়া তিনি যে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছেন— ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, তিনি মিথ্যা ও কপটতার আশ্রয় লইয়া রাজনীতি করিবেন। পাটনা হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার বিমানটি দমদম বিমানবন্দরের আকাশে আধঘণ্টা চক্কর কাটিয়া অবতরণের ঘটনাটিকে তিনি তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। ঘটনা হইল, বিমানে সাধারণ নাগরিকরাও তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। এইরূপ হইলে তাঁহারাও নিহত হইতেন। এই অভিযোগ তাই ভিত্তিহীন। ইতিপূর্বে বামফ্রন্টের আমলেও তিনি এইরূপ অভিযোগ তুলিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো অভিযোগই এযাবৎ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

এইখানেই শেষ নহে। তিনি এইবার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়াছেন। কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি শহরে টোলপ্লাজায় সেনা মোতায়েন করা হইয়াছিল। ইহা সেনাবাহিনীর একটি রুটিন কাজ। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে মাঝেমধ্যেই এইরূপ করা হইয়া থাকে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ সেনা কর্তৃপক্ষ রাজ্য প্রশাসনকে কোনো কিছু না জানাইয়াই ইহা করিয়াছে। তাঁহার আরও বক্তব্য, রাজ্যের সচিবালয়ের অনতিদূরে এই সেনা মোতায়েন তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র। একজন মুখ্যমন্ত্রী পদমর্যাদার ব্যক্তি এইরকম হাস্যাস্পদ অভিযোগ করিবেন, ইহা কল্পনার অতীত। রাজ্য পুলিশও সেনার বক্তব্যকে অস্বীকার করিয়া নিজেদের তৃণমূল কংগ্রেসেরই একটি শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠির বক্তব্য, সেনাবাহিনীর মতো দায়িত্বপূর্ণ সংগঠনের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করিবার আগে বিবেচনা করা দরকার। সেনারা তোলা তুলিতেছে— সেনাবাহিনীকে এমন হীনভাবে চিহ্নিত করা ঠিক নহে। এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী জানাইয়াছেন— রাজ্যপাল কেন্দ্রের সুরে সুর মিলাইয়া কথা বলিতেছেন। তিনি এইখানেই থামেন নাই। শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল রাজভবনে গিয়া রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং নিজেদের অভিযোগ জানাইয়াছেন। প্রতিনিধিমণ্ডলও রাজ্যপালের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, ঘটনার সময় যেহেতু রাজ্যপাল শহরের বাহিরে ছিলেন তাই এই বিষয়ে তাঁহার কথা বলা উচিত হয় নাই। রাজভবনের সম্মুখে তাঁহারা বিক্ষোভও প্রদর্শন করিয়াছেন।

রাজ্যপালের বক্তব্য শাসক তৃণমূল দলের পছন্দ হউক বা না-হউক, মনে রাখিতে হইবে রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। সেনা সম্পর্কে কেউ বিরূপ ধারণা পোষণ করিলে রাজ্যপাল নিজের প্রতিক্রিয়া জানাইতেই পারেন। ইহা তাঁহার সাংবিধানিক অধিকার। রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরোধিতা পশ্চিমবঙ্গে নূতন কোনো বিষয় নহে। বামপন্থীদের ৩৪ বছরের শাসনকালে বেশ কয়েকটি বিষয়ে বিরোধিতা হইয়াছে। কিন্তু সে বিরোধিতা ছিল নীতিগত এবং যুক্তিসাপেক্ষ। বামপন্থীরা তো এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজ্যপাল পদটিই তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস এবং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে রাজ্যপালের বিরোধিতা করিতেছেন তাহা যুক্তিসঙ্গতও নহে, উচিতও নহে। সেনাবহিনীকে কলঙ্কিত করিবার স্তরে যদি রাজনীতি পৌঁছাইয়া যায়, তবে ওইসব রাজনীতিকদের বলিতে হয় — ছিঃ ! লজ্জা-শরম কিছু নাই।

## সুভাষিতম্

**বনানি দহতো বহ্নিঃ সখা ভবতি মারুতঃ।**

**স এব দীপনাশায় কৃশে কস্যাস্তি সৌহৃদম্।।**

জঙ্গলে আগুন লাগলে বাতাস আগুনের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। আবার ওই বাতাসই দুর্বল প্রদীপশিখা নিভিয়ে দেয়। দুর্বলকে কেউ সাহায্য করে না; শক্তিশালী হওয়া উচিত।

# সন্ত্রাস প্রশ্নে পাকিস্তানকে তুলোধোনা আফগান রাষ্ট্রপতির

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** এবার আফগান রাষ্ট্রপতি আশরফ গনির সরাসরি তোপের মুখে পাকিস্তান। গত ৪ ডিসেম্বর অমৃতসরে হার্ট অব এশিয়ার ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে এসে গনি সরাসরি পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুলে বলেন যে, তাঁর দেশ আফগানিস্তানে তালিবান সমেত বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে ক্রমাগত মদত দিয়ে অঘোষিত যুদ্ধের পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে পাকিস্তান। তিনি এও দাবি করেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে ভারতের উত্তরোত্তর গঠনমূলক কাজে যুক্ত হওয়ার পিছনে কোনো গোপন চুক্তি নেই। রীতিমত তথ্য প্রমাণ হাজির করে এবং এক তালিবান শীর্ষ নেতার উদ্ধৃতি তুলে ধরে আফগান প্রেসিডেন্ট বলেন, পাকিস্তানে সুপরিকল্পিতভাবে জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এশিয়া কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকা দরকার, যার পেছনে কোনো ধরনের 'খেলা' (পড়ুন ষড়যন্ত্র) থাকবে না এবং যে কোনো রকমের সন্ত্রাস, উগ্রপন্থা ও অবৈধ কাজকর্মের বিরুদ্ধে তা সক্রিয় হবে। তাঁর বক্তব্য, ২০১৪ সালের শীতের পরেই পাকিস্তান আফগানিস্তানে 'অঘোষিত যুদ্ধে'র খেলায় মেতে ওঠে এবং সম্প্রতি ব্রাসেল শীর্ষ বৈঠকেও একই ধরনের অভিযোগ তিনি করেছেন। তিনি এও বলেন, সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসী হানায় মদত দেওয়া এবং তা অস্বীকার করা পাকিস্তানের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং গত কয়েক মাসে এই প্রবণতা ভয়ানকভাবে বেড়ে গিয়েছে।

একইসঙ্গে আফগান রাষ্ট্রপতি সন্ত্রাস প্রতিরোধে একটি আন্তর্জাতিক তহবিল গড়ে তোলারও দাবি জানান। আশরফ গনির এই ধরনের আক্রমণের মুখে দৃশ্যতই হকচকিয়ে যান পাক প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ বিষয়ক পরামর্শদাতা সরতাজ আজিজ। যিনি হার্ট অব এশিয়া, ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানকারী ৩০ জন প্রতিনিধির মধ্যে অন্যতম। এই সম্মেলনের উদ্বোধনে আশরফ গনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সহযোগীই ছিলেন। আশরফ গনির বক্তব্য, পাকিস্তান আফগানিস্তানে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করলেও যতক্ষণ না সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া বন্ধ করবে, ততক্ষণ এই টাকা অর্থহীন বলেই মনে হবে। তিনি আরও বলেন, ব্রাসেল সম্মেলনের পর ৫ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত পাক-মদতে সন্ত্রাসের মাত্রা কয়েকগুণ ছাড়িয়েছে।

পাকিস্তানকে তুলোধোনা করার পাশাপাশি ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করেন আফগান রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, 'ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের কোনো গোপন বোঝাপড়া নেই। আফগানিস্তানে ভারতের ভাবমূর্তি ও বিনিয়োগ দুই-ই স্বচ্ছ।' তিনি আফগানিস্তানে ভারতের বিনিয়োগ ১ বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ২ বিলিয়ন ডলার করার জন্য নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ দেন। তিনি গত ৩ ডিসেম্বর বিকেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে যান এবং মধ্য এশিয়া, রাশিয়া ও অন্য দেশের ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে অমৃতসর অচিরেই গড়ে উঠবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

## হিন্দুদের বিতাড়নের বিরুদ্ধে সক্রিয় বজরঙ্গ দল

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** যদি কাউকে নিজেদের বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয়, তবে তারা 'হিন্দু হেল্প লাইন'-এ সাহায্য নিতে পারেন। সম্প্রতি পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে বজরঙ্গ দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই মর্মে প্রচার করছে। হিন্দু হেল্প লাইন ছ'বছর ধরে কাজ করে চলেছে। কৈরানা-র মতো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে বজরঙ্গ দলের রাজ্য আহ্বায়ক বলরাজ ডুনাগর জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গতবছর উত্তরপ্রদেশের মীরাটের কাছে কৈরানা থেকে মুসলিম দুষ্কৃতিরা কয়েকশো হিন্দু পরিবারকে ঘরছাড়া করতে বাধ্য করে।

এবিষয়ে এপর্যন্ত কি করা হয়েছে বলে প্রশ্ন করা হলে শ্রীডুনাগর জানান, এনিয়ে কারও অভিযোগ পুণা কলসেন্টারে পৌঁছলে সংগঠনের স্থানীয় শাখাগুলিকে সচেতন করে দেওয়া হয়। তারাই উৎপীড়িত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করে আইন মোতাবেক সব রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাদের পাশে দাঁড়ান।

গত নভেম্বর থেকে এই অভিযান শুরু হয়েছে। হিন্দুরা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে আজ যে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বজরঙ্গ দল তাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হিন্দুদের সংগঠিত করতে চায় বজরঙ্গ দল।

# এন জি ও-র টাকা আত্মসাৎ করেছেন তিস্তা শিতলবাদ : দাবি পুলিশের

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের কাছে দেওয়া তাদের লিখিত বয়ানে গুজরাট পুলিশ ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার শরণার্থীদের সাহায্যে প্রেরিত ৯.৭৫ কোটি টাকার একটা বড় অংশ (৩.৮৫) কোটি টাকা সমাজকর্মী তিস্তা শিতলবাদ ও তাঁর স্বামী নিজেদের নামে জমা করেছেন বলে জানিয়েছে। দাঙ্গা পীড়িতদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এই বিপুল অংশের অনুদান যে তিস্তা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছেন সে বিষয়ে পুলিশের হাতে পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে বলেই খবর।

পুলিশের সহ-কমিশনার রাহুল প্যাটেলের তরফে এই মর্মে দেওয়া ৮৩ পাতার হলফনামায় নির্দিষ্ট করে অভিযোগ করা হয়েছে যে, গুলবার্গ সোসাইটির দাঙ্গা পীড়িতরা তাদের সাহায্যার্থে আসা টাকা তিস্তা ও তাঁর স্বামী জাভেদ আনন্দের অন্যায়ভাবে হস্তগত করার প্রতিকার পেতেই মামলাটি দায়ের করেছিলেন। আদালত সূত্রে প্রকাশ, তিস্তা ও তাঁর সংস্থা 'সেন্টার ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস' ও 'সবরং'-এর তরফে তদন্তকারীদের সবরকমের অসহযোগিতা করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টি-সহ প্রমাণ লোপাটের চেষ্টাও করা হয়।

এই সূত্রে গুজরাট উচ্চ আদালত তাঁদের আগাম জামিন না-মঞ্জুর করায় তাঁরা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন করেন। বিচারপতিরা পত্রপাঠ তাঁদের তদন্তের স্বার্থে সবরকমের তথ্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

গুজরাট পুলিশ মহামান্য আদালতকে জানায়, তারা তিস্তার সংস্থার ব্যাঙ্কের হিসেব ২০০৭ থেকে ২০১৪ অবধি যাচাই করেছেন। অনুসন্ধান অনুযায়ী বিদেশি ও দেশি অনুদান মিলিয়ে প্রায় ৯.৭৫ কোটি জমা পড়া টাকা থেকে তিস্তা-দম্পতি ৩.৭৫ কোটি টাকা নিজেদের স্বার্থে উঠিয়ে নিয়েছেন। এছাড়া পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, দাঙ্গা পীড়িতদের কল্যাণকার্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের দেওয়া ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ১.৪০ কোটি টাকাও এই দুজন কৌশলে বের করে নিয়েছেন। পুলিশ তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে, প্রাথমিকভাবে তারা তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ পেলেও যেইমাত্র তদন্তের খাতিরে সেগুলি বাজেয়াপ্ত হয় (২০১৪) সেই মুহূর্তেই তিস্তার দলবল সংস্থার দুটি এযাবৎ অপ্রকাশিত অন্য অ্যাকাউন্ট থেকে ২৪.৫ লক্ষ ও ১১.৫ লক্ষ টাকা সরিয়ে ফেলে। এই টাকা একই দিনে তারা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট মারফত সরিয়ে ফেলে। পুলিশের তরফে এই দম্পতির বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ও উচ্চ আদালতকে ভ্রান্ত তথ্য প্রদান, তথ্য গোপন করার মতো গর্হিত কাজেও লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ পুলিশ জানিয়েছে, তিস্তার সংস্থা নাকি বিনা খরচায় দাঙ্গা-পীড়িতদের হয়ে মামলা লড়ত, এমন দাবি করলেও খাতায়-কলমে তাদের ঘনিষ্ঠ নানা উকিলকে এবাবদ প্রায় ৭১.৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। তিস্তা শিতলবাদের সমাজসেবা এখন গভীর গাড্ডায়— এমনটাই শোনা যাচ্ছে।

## বিচারপতি নিয়োগ : সুপারিশ স্থগিত রাখল কলেজিয়াম

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুর আগামী ৩ জানুয়ারি অবসর নেবেন। তাই তাঁরই নেতৃত্বাধীন কলেজিয়াম বিচারকদের শূন্যপদ পূরণের জন্য নাম সুপারিশ করা আপাতত স্থগিত রাখল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উচ্চ আদালতে কারা বিচারপতি হবেন সে ব্যাপারে কলেজিয়াম যেসব প্রার্থীর নাম সুপারিশ করে তাঁদেরই নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার। কিছুদিন আগে প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুর আদালতের শূন্য পদ পূরণে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট উদ্যোগী নয় বলে অভিযোগ করেছিলেন। এও সত্যি, প্রধান বিচারপতির অবসর গ্রহণের সঙ্গে উচ্চ আদালতে অতিরিক্ত সাতটি পদ শূন্য হবে। তা সত্ত্বেও খোদ প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুরের পৌরোহিত্যে কলেজিয়ামের সাম্প্রতিক বৈঠকে স্থির হয়েছে, বিচারপতিদের নাম সুপারিশ করার দায়িত্বভার নতুন প্রধান বিচারপতি জগদীশ সিং খেহারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি শপথ গ্রহণ করবেন জানুয়ারির ৪ তারিখে।

প্রধান বিচারপতি ছাড়াও ওইদিন আরও যাঁরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দীপক মিশ্র, জে চেলামেশ্বর, রঞ্জন গোয়েল এবং মদন বি লোকুর। এঁদের নাম কলেজিয়াম আগেই সুপারিশ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর থেকে জে চেলামেশ্বর কলেজিয়ামের কোনো বৈঠকে অংশ নেননি। তাঁর অভিযোগ, বিচারপতি নিয়োগের কোনো পরিকাঠামোই কলেজিয়ামের নেই। না আছে অফিস, না আছে যেসব প্রার্থীর নাম সুপারিশ করা হবে তাদের বক্তব্য রেকর্ড করে রাখার ব্যবস্থা। সাম্প্রতিককালে উচ্চ আদালতের অনেক বিচারপতিই জে চেলামেশ্বরকে সমর্থন করেছেন। অনুরোধও করেছেন বৈঠকে যোগ দেবার জন্য। তাঁদের বক্তব্য, জে চেলামেশ্বরের অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কলেজিয়ামের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

# নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব ছাড়া প্যারিস চুক্তির সাফল্য অসম্ভব : আমেরিকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** আমেরিকার তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব ছাড়া প্যারিস চুক্তির সাফল্য সম্ভব নয়। ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি প্রসঙ্গে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মার্কিন প্রিন্সিপ্যাল ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি তারিক শালট্জ গ্রিন হাউস্ গ্যাস আন্দোলন এবং বিশ্ব পরিবেশ চুক্তি সম্পাদনে

নরেন্দ্র মোদীর অবদানের কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, পারিস চুক্তি যাতে সফল হয় তার জন্য নরেন্দ্র মোদী এবং প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা একযোগে কাজ করেছেন।

বস্তুত নরেন্দ্র মোদীর জন্যই আরও অন্তত ২০০টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করে। সুতরাং তাঁর নেতৃত্ব ছাড়া এই চুক্তির সাফল্য সম্ভব নয়। তিনি আরও জানান, ব্যক্তিগতভাবেও বারাক ওবামা নরেন্দ্র মোদীকে খুব পছন্দ করেন। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ভবিষ্যত নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি জানান, দু'দেশে আগে যেমন বন্ধু ছিল ভবিষ্যতেও তাই থাকবে।

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

# মাতব্বরি নয়, যথার্থ দিদির মতো ব্যবহারই আপনার শোভা পায়— মমতাকে জবাব জেডিইউ-র

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাটনার সভা থেকে নাম না করে জেডিইউ সভাপতি ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে 'গদ্দার' আখ্যা দিয়ে কুৎসিত ব্যক্তি আক্রমণ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তার প্রত্যুত্তর দিয়েছে নীতীশের দল। দলের তরফে বলা হয়েছে, 'ওহ দিদি কা রূপ মেঁ বহুত অচ্ছি লগতি হ্যায়, উনহে দাদাকে রূপমেঁ ব্যওহার নেহী করনা চাহিয়ে'— একথা জানিয়েছেন দলের মুখপাত্র কে সি ত্যাগী।

পাটনায় নীতীশের নাম না করলেও যারা নোটবন্দির বিরোধে তার সঙ্গে হাত মেলাননি তাদের গদ্দার বা বিশ্বাসঘাতক তক্‌মা দিয়েছেন মমতা। প্রসঙ্গত, কালোটাকার বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে নীতীশকুমার গোড়া থেকেই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মত দিয়েছেন। তাই এক্ষেত্রে কু-বিশেষণটি যে তাঁর উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত তা বুঝতে নীতীশের দেরি হয়নি। পাটনার জে ডি ইউ-এর কার্যকর্তারা এ খবরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। দলের তরফে জানানো হয়, মমতার তৃণমূলদল একটি কেলেঙ্কারিবাজদের দল। একই সঙ্গে মমতার দল যে বিপুল কালোটাকা লুঠ করেছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও সমর্থকদের মুখে শোনা যায়।

দলের মুখপাত্র রাজীব রঞ্জন আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চিটফান্ড ব্যবসাই বিপুল কালোটাকার পাহাড়। জে ডি ইউ বিশ্বাস করে এগুলির বিরুদ্ধে আশু অনুসন্ধান প্রয়োজন।

এদিকে দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে নীতীশ জানিয়েছেন, 'কারণে অকারণে অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক হয়ে উনি একজন নেতা নেত্রী সম্পর্কে মানুষের মনে ভুল ধারণা উস্কে দিতে পারেন'। এটি যে মমতার উদ্দেশ্যেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

# বুরহান ওয়ানিকে হাফিজ সইদের আশীর্বাদ

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যাবার আগে হিজবুল মুজাহিদিন নেতা বুরহানওয়ানি লস্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ সইদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিল। হাফিজ সইদ তাকে নিরাশ করেনি। কাশ্মীর এবং ধর্মের জন্য লড়াই-এ ওয়ানি যাতে সফল হতে পারে তার জন্য শুভকামনা জানিয়েছিল। সম্প্রতি সি এন এন-নিউজ ১৮ চ্যানেলে প্রকাশিত এক অডিওটেপ থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। দীর্ঘ আলাপচারিতায় ওয়ানি বারবার হাফিজের ‘দক্ষতা ও আত্মত্যাগের’ ভূয়সী প্রশংসা করেছে। হাফিজও হিজবুল জঙ্গিদের সব ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিজবুল এবং লস্কর দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম করছে। হিজবুল মূলত জঙ্গি হামলার দিকটা দেখে। অন্যদিকে লস্করের দায়িত্ব অর্থ জোগানো এবং জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

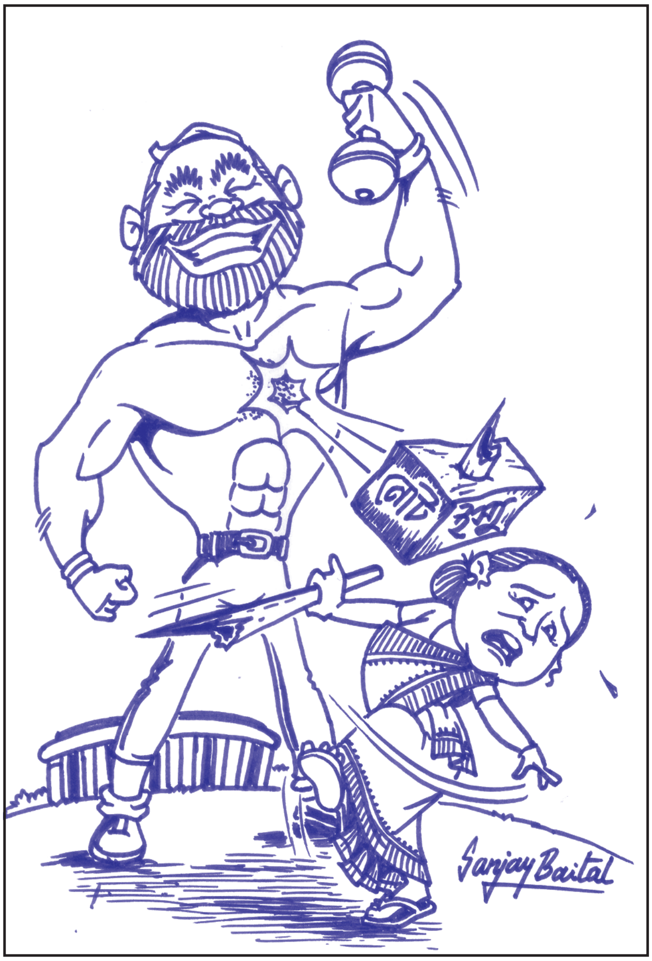


## উবাচ

“কংগ্রেস সরকার ৫০ বছরে যা করতে পারেনি, মোদী সরকার তা আড়াই বছরে করে দেখিয়েছে।”

*উত্তরাখণ্ডে দ্বারাহাটে বিজেপির পরিবর্তন র‍্যালিতে প্রধানবক্তারূপে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন*

**সুরেশ প্রভু**
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী

“টাকা তোলার সত্যতা প্রমাণ করুন। প্রমাণ থাকলে তদন্ত হবে। রাজ্যকে আগাম জানিয়েই এই অনুশীলন।”

*মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর টোলপ্লাজায় সেনাবাহিনীর টাকা তোলার অভিযোগের জবাবে*

**মেজর জেনারেল সুনীল যাদব**
ইস্টার্ন কমান্ড

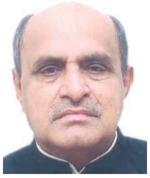

“দিদি হিসেবে ওঁকে খুব ভালই লাগে, দাদা হিসেবে ওঁর ব্যবহার করা উচিত নয়।”

*তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকুমারকে ‘গদ্দার’ বলা প্রসঙ্গে*

**কে সি ত্যাগী**
জে ডি (ইউ)-র সাধারণ সম্পাদক

“আফগানিস্তানের মানুষের জীবনে সুখসমৃদ্ধির জন্য ভারতের সহযোগিতা খুব প্রয়োজন।”

*হার্ট অব এশিয়া সম্মেলনে ভারতের প্রশংসা প্রসঙ্গে*

**আশরফ গনি**
আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি

“যে সব মুসলমান প্যালেস্টাইন বিষয়ে মুখর হয়, কিন্তু বালুচিস্তানে পাকিস্তানের অবৈধ দখলদারি নিয়ে টুঁ শব্দটি করে না তারা নিশ্চিত ভাবেই পাকিস্তানি।”

*এক শ্রেণীর মুসলমানের মনোভাব সম্পর্কে টুইটবার্তায়*

**তারিক ফতেহ**
ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট কানাডিয়ান লেখক

# দিদি দিল্লী, পাটনা ঘুরে যতই নাটক করুন না কেন হালে পানি পাচ্ছেন না

আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে ছাড়বেন। প্রতিদিন তিনি নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে হুঙ্কার ছাড়ছেন আর বলছেন বিজেপি নেতারা তাঁকে খুন করার ষড়যন্ত্র করছেন। দিল্লী থেকে কলকাতায় ফেরার সময় তাঁর বিমানকে ষড়যন্ত্র করেই দমদমে নামার অনুমতি দিতে বিস্তর টালবাহানা করা হয়। যাতে বিমানের জ্বালানি ফুরিয়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে সেনা শাসন চালু করে দিদিকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টাও করেছে কেন্দ্র। এই নাটুকেপনা করে দিদিভাই মানুষের সমর্থন পেতে চাইছেন। লাভ নেই। রাজ্যের মানুষ জানেন যে সারদার বিপুল টাকা লুকিয়ে রেখে তাঁর ভাইয়েরা এখন দিশাহারা হয়ে দিদির কাছে মাথা চাপড়াচ্ছে। মেলা, উৎসব, সাইকেল বিলি, ক্লাবের অনুদান সবকিছুই বন্ধ। দিদি ভাই প্রলাপ বকছেন। তিনি নাকি মোদীজীর গদি উল্টে দিতে পারেন।

তবে দিদির প্রলাপে বিজেপি বা নরেন্দ্র মোদীজীর কিছু যায় আসে না। কারণ দেশটার নাম ভারতবর্ষ এবং জাতীয় রাজনীতিতে নৌটঙ্কি করে কল্কে পাওয়া যায় না। এর প্রমাণ, মহারাষ্ট্রে প্রথম দফার পুরসভার নির্বাচনে ১৬৪টি পুরসভায় বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। দেখা যাচ্ছে যে পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোট বাতিলের ফলে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের যে হয়রানি চলছে তার প্রভাব ভোটের বাক্সে পড়েনি। মনে রাখতে হবে, এই নির্বাচন ছিল নোট বাতিলের পর দেশের প্রথম গণভোট। বিরোধিরা মরিয়া চেষ্টা করেছিল হয়রানি এবং জনঅসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ভোটে জিততে। সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মানুষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে তাঁদের যত অসুবিধেই হোক দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেন। একেই এক কথায় দেশপ্রেম বলে। প্রসঙ্গত, একটা কথা মানতেই হবে যে প্রধানমন্ত্রীর নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার পরিকল্পনাতে

**গূঢ় পুরুষের কলম**

গাফিলতি ছিল। এই গাফিলতির জন্যই মানুষের ভোগান্তি হচ্ছে। পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রধান দায়িত্ব ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের। তাঁদের না জানার কারণ নেই যে নভেম্বর মাসে কৃষিজীবী চাষি ভাইয়েরা রবি শস্য ফলনের জন্য সার, বীজ ইত্যাদি নগদ টাকায় কেনেন। এই নগদ টাকাটা তাঁদের ঘরে আসে নতুন ওঠা ফসল ব্যাপারিদের কাছে বিক্রি করে। নোট বাতিলের ফলে কৃষিপণ্যের ব্যাপারিরা নগদ টাকার অভাবে কৃষকদের কাছে ফসল কিনতে পারেনি। ফসলের দাম ৪০ শতাংশ কমেছে। এরপরেও সারা দেশে মোদী বিরোধী হাওয়া নেই। দিদি দিল্লী, পাটনা ঘুরে যতই নাটক করুন না কেন হালে পানি পাচ্ছেন না। মানুষ জানেন এই হয়রানি ভোগান্তি সাময়িক। পরবর্তী সময়ে কালো টাকার রমরমা বন্ধ হবে। সুস্থির হবে দেশের অর্থনীতি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের আমলারা বাস্তব অবস্থা বা গ্রাউন্ড রিয়েলিটিটা অনুধাবন করতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং অর্থ মন্ত্রকের কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পরেই নোট বাতিলের ঘোষণা করেছিলেন। তাঁকে নিশ্চয় বলা হয়েছিল যে নোট বদল করে নিলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে না। এইসব আমলাদের গাফিলতির জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না কেন?

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের পুরনো পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোট ব্যাঙ্কে জমা পড়বে না। সহজ কথায়, এই টাকাটা কালোটাকা। যদিও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অনুমান ছিল দশ লক্ষ কোটিটাকার বাতিল নোট ব্যাঙ্কে জমা পড়বে না। কালো টাকার ছবিটা স্পষ্ট হবে ব্যাঙ্কে বাতিল নোট জমা দেওয়ার সময়সীমা পার হওয়ার পর। তবে যত টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়বে না ততটাই সরকারের লাভ। সরকার রাজকোষে ঘাটতি কমাতে পারবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেশি মূলধন জোগাতে পারবে। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে খরচ বাড়াতে পারবে। সাধারণ আয়করদাতাদের কর ভার কমাতে সক্ষম হবে। এখনই আগাম বলে দেওয়া যায় যে এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে আয় করে বিপুল ছাড় দেওয়া হবে। এই কারণেই মহারাষ্ট্রে পুরভোটের প্রথম দফার ফল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিজেপির দরিদ্রমুখী এবং উন্নয়নের রাজনীতির জয় হয়েছে।' বণিকসভা সি আই আইয়ের সভাপতি নৌশাদ ফোর্বসের মতে, 'দীর্ঘ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপ দেশের পক্ষে ভাল।' কিন্তু যাঁরা নগদে ব্যবসা করেন তাঁরা জোর ধাক্কা খেয়েছেন। গত ৮ নভেম্বর নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণার তিন সপ্তাহ পরে খোলাবাজারে চাহিদা কমেছে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে যে নগদ টাকায় কারবারে দুর্নীতিটা বেশি হয়। সরকার বিক্রয়কর আয়কর কিছুই পায় না। কারবারের লেনদেন বন্ধ হবে। সরকারকে দেয় কর ফাঁকি দিয়ে জমানো টাকাকেই কালো টাকা বলে। তাই কালোটকার দূষণ থেকে দেশের অর্থনীতিকে বাঁচাতে আমাদের কয়েক মাস কষ্ট করতে হবে। দেশের স্বার্থ ব্যক্তি স্বার্থের থেকে অনেক বড়। ■

# দিদি সত্যিই, গরিবদরদি, মোদীজী প্লিজ চিঠিটা পড়ুন

মাননীয় নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার

সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি এখন জন-গণ-মন অধিনায়ক। এই প্রথম দেশের মানুষকে কষ্ট দিয়েও তাদের মন জিতে নিল কেউ। আপনি কি জাদুকর!

যাই হোক, আপনি গরিবের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছেন আর দিদি ভাইদের দিয়ে সেই অ্যাকাউন্টে টাকার পাহাড় জমিয়ে রাজ্যকে এক নম্বরে নিয়ে গিয়েছেন। জন ধন অ্যাকাউন্টে সব থেকে বেশি জমা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। দিদির বাংলায়। তবে বলুন কে বেশি গরিবদরদি? আপনি না দিদি!

চুপ করে গেলেন তো! আরও সব বললে আপনি চমকে যাবেন। গরিব মানুষ হাতে টাকা পেলে খরচ করে ফেলতে পারে ভেবে দিদি একশোদিনের কাজের টাকা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। শ্রমিকদের দেননি ১৪৫০ কোটি টাকা। এতেও সারাদেশের মধ্যে প্রথম। এবারেও বলুন, কে বেশি গরিবদরদি? আপনি না দিদি!

বিশ্বাস হচ্ছে না! ঠিক আছে, আমি বিস্তারিত হিসেব দিচ্ছি।

শ্রমিকদের প্রাপ্য ১০০ দিনের কাজের টাকা অনেক রাজ্যই বাকি রেখেছে। শ্রমিকদের এখনও দেয়নি। কিন্তু সেই টাকা বাকি রাখার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। নারেগা আইনের ২৯ নম্বর ধারাতে বলা রয়েছে, কাজ করানোর ১৫ দিনের মধ্যে শ্রমিকদের মজুরির টাকা পুরো মিটিয়ে দিতে হবে। সেটা না পারলে যতদিন দেরি হবে, সেই হিসেবে মজুরির উপরে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। একটি মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টও একই নির্দেশ দিয়েছে।

খবরে প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশে মজুরি

বকেয়া বাবদ ক্ষতিপূরণ মেটাতে হবে মাত্র ১০৫ কোটি টাকা। তামিলনাড়ু সরকারকে দিতে হবে ১০০ কোটি। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মজুরি আর ক্ষতিপূরণ মিলিয়ে দিতে হবে প্রায় ১৪৫০ কোটি টাকা।

মোদীজী, আপনি বড় নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে যখন মুখ্যমন্ত্রী কড়া প্রতিবাদে নেমেছেন তখনই এক দল দিদি বিরোধী লোক সামনে এনেছে গরিব শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা বাকি রাখার খবর। খবরে প্রকাশ, ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজ করিয়ে নিলেও শ্রমিকদের মজুরি বাবদ প্রায় ১১০০ কোটি টাকা দিতে পারেনি রাজ্য। সময়মতো মজুরি না-দেওয়ায় ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজ্যকে আরও ৩৪৩ কোটি টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। অনেক রাজ্যই ক্ষতিপূরণ-সহ শ্রমিকদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছে। তাই অনেকটাই চাপে দিদির রাজ্য সরকার।

ওই খবরে বলা হয়েছে, মজুরি বকেয়া রাখার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশে প্রথম। গত আর্থিক বছরে কাজ করিয়েও ২৪০০ কোটি টাকা মজুরি শ্রমিকদের দেয়নি রাজ্য। এ বছর এখনও পর্যন্ত বকেয়া মজুরির পরিমাণ প্রায় ১১০০ কোটি টাকা। অথচ এখনও পর্যন্ত ১০০ দিনের প্রকল্পে রাজ্যকে ৪০০০ কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র।

তবে কি ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা অন্য খাতে খরচ করেছে রাজ্য সরকার? কোন খাতে খরচ হয়েছে? উঠছে এমন প্রশ্নও।

সে প্রশ্ন উঠুক। কিন্তু আমি জানি, দিদি ওই টাকা সরিয়ে রেখেছেন। গরিবকে টাকা দেওয়া মানেই সেটা নষ্ট। আজেবাজে খরচ করে ফেলবে। ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাবে, মা-বাবাকে ডাক্তার দেখাবে, ওষুধ কিনবে, পেট ভরে খাবে। এসব বাজে খরচ যাতে না হয় তাই তো গরিবদরদি দিদি টাকাই মেটাননি। তাছাড়া ১০০ দিনের কাজ করেছে ঠিক আছে, তাবলে ফলের আশা করবে কেন? অশিক্ষিত গরিবগুলো গীতাও পড়েনি।

আবার জানতে চাইছি—বলুন, কে বেশি গরিবদরদি? আপনি না দিদি!

**—সুন্দর মৌলিক**

# লুটের রাজনীতি না হলে নোট বাতিলের প্রয়োজন হোত না

সাধন কুমার পাল

পাঁচশো ও হাজারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত দেশের সোয়াশো কোটি মানুষের প্রত্যেককেই কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত করেছে। নোট বাতিলের অভিঘাত দেশের সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে গিয়েছে প্রতিবেশী দেশগুলিতেও। ব্যাঙ্ক এটিএমের সামনে লম্বা লাইন। কোটিপতি থেকে শুরু করে দিন-আনি-দিন-খাই সবাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই লাইনে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পর কোথাও মিলছে দশ হাজার কোথাও দুই হাজার আবার কোথাও এক হাজার। তাতে মানুষের পরোয়া নেই। ধনী-দরিদ্র ব্যাঙ্কের সামনে একই লাইনে। এই সাম্যের দৃশ্য তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন দেশের কোটি কোটি আমজনতা। ব্যাঙ্কের সামনে টাকার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করাটাও আমজনতা দেশের জন্য 'কিছু করছি' হিসেবে দেখছেন। কালো ধনের মালিক, টাকার কুমিররা চোখে সরষে ফুল দেখছেন ভেবে পুলকিত হচ্ছেন খেটে খাওয়া মানুষ। এলাকার কালোবাজারি, ঘুষখোর, অসৎ অহঙ্কারী বিত্তবান, নেতা, মন্ত্রী, ব্যবসায়ীদের নিয়ে পাড়ার আড্ডা, চায়ের দোকান, ব্যাঙ্কের লাইন, অফিস কাচারি সর্বত্রই নিত্যনতুন মুখরোচক গল্প আমদানি হচ্ছে।

গঙ্গায় ভাসছে পাঁচশো ও হাজারের নোট, পাড়ার ভ্যাটে কে বা কারা ফেলে দিয়েছে ব্যাগ ভর্তি পাঁচশো ও হাজারের নোটের টুকরো, চেকিং করতে গিয়ে কয়েক কোটি টাকা-সহ পাকড়াও এক ব্যবসায়ী, মোদীর দয়ায় এক লাইনে কাজের লোক আর মালকিন— প্রতিদিনই এরকম নানা খবর ভেসে আসছে টিভির পর্দায় বা খবরের কাগজে। খবর আসছে নোট বাতিলের জেরে কাশ্মীরে ঢিল ছোঁড়া বন্ধ, বন্ধ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তান-বাংলাদেশে ভারতীয় জালনোটের কারখানা, জমিয়ে রাখা নোটের পাহাড় কাগজের টুকরোয় পরিণত হওয়াতে দিশেহারা মাওবাদীরা, তছনছ হয়ে গিয়েছে দাউদের সাম্রাজ্য, জেহাদি নেটওয়ার্ক, এক ঝটকায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া থাকা সত্ত্বেও অপ্রতিরোধ্য গোরু পাচার চোরাচালান।

পুঁজিপতিদের কালোপুঁজির পাহাড় ধ্বংসের অভিঘাতে অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করেছে সর্বহারার মার্কামারা মূলস্রোতের বামপন্থী দলগুলিও। মালিক ও শ্রমিককে একলাইনে দাঁড়াতে দেখে ওদেরই সবচেয়ে খুশি হওয়ার কথা। এদের অচেনা, অস্বাভাবিক এবং অদ্ভুত আচরণে অবাক হয়ে যাচ্ছে মানুষ। কালোপুঁজির পাহাড় ধ্বংসের কারিগর নরেন্দ্র মোদীকে ডানপন্থী পুঁজিপতির দালাল বলে ২৪ ঘণ্টা গাল পাড়তে অভ্যস্ত সর্বহারার মার্কামারা বামপন্থী দলগুলিও অন্যান্য বিরোধীদলের সঙ্গে জোট বেঁধে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিপাকে ফেলার সমস্ত রকম প্রয়াস করছে।

নোট বাতিলের ঘোষণার পর নগদের অভাবে বিয়ে স্থগিত, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা বিভ্রাট, বাজারহাট ফাঁকা, কিংবা নগদ সংগ্রহে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে হার্টঅ্যাটাকে মৃত্যু এমন কিছু দুঃখজনক ঘটনার খবর বিভিন্ন দিক থেকে আসছে। এই ঘটনাগুলি না ঘটলেই ভালো হোত। এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে শিরোনাম করে অনেক সংবাদপত্র দিনের পর দিন এবং অনেক টিভি চ্যানেল ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্তেজক প্রতিবেদন পেশ করে মানুষকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। মিডিয়ার একাংশের এই ধরনের আচরণ থেকে কি এটাই মনে হয় না যে কালোপুঁজি এখনো লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে দেয়নি। বরং সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে?

ঠিক একই রকম ভাবে রাস্তায় নেমে সরাসরি মানুষকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো কিছু নেতা-নেত্রী। প্রত্যক্ষভাবে ব্যাঙ্ক, এটিএমের সামনে অপেক্ষমান মানুষকে উত্তেজিত করে অঘটন ঘটিয়ে দেওয়ার সব রকম প্রয়াস হচ্ছে। তিন দিনের আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছে। তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের কাছে প্রতিবাদের ঝড় তোলার আহ্বান জানানো হচ্ছে। সমস্ত বিরোধীদল মিলে ধরনা দিচ্ছে যন্তর মন্তরে। মানুষ কিন্তু অনড়, কোনোভাবেই সাড়া আসছে না আমজনতার তরফে।

কোনো কঠিন লক্ষ্যের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত কষ্ট সহ্য করে থাকে, মুদ্রারহিতকরণ-জাত সমস্যার মুখোমুখি হয়ে ঠিক সে রকম প্রত্যয়ই যেন ফুটে উঠছে আমজনতার চোখে মুখে। এই পরিস্থিতিতে হওয়া উপনির্বাচনের ফলাফলেও বিজেপি পক্ষে বাড়তি জনসমর্থন প্রমাণ করছে মানুষ এই পদক্ষেপের পক্ষে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অ্যাপ সার্ভেতেও দেখা গেছে ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ কালোটাকার বিরুদ্ধে মুদ্রারহিতকরণের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছে। বর্তমান সরকারকে বিপাকে ফেলার জন্য করানো জনমত সমীক্ষায়ও অবিশ্বাস্য জনসমর্থনের চিত্র উঠে আসছে। দেশের ভেতরেই নয় বিশ্ব জুড়ে এমনকী চীন-পাকিস্তানের মতো ভারত-বৈরী দেশও প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে সাহসী ও অসাধারণ পদক্ষেপ বলে প্রশংসা করছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে সমর্থন করলেও বিরোধীরা মরিয়া হয়ে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পথে নামল কেন? ৮ নভেম্বর যখন প্রধানমন্ত্রী ৫০০ ও ১০০০-এর মুদ্রারহিতকরণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তখন প্রথম দু'একদিন বিরোধীদের

অনেকে চুপচাপই ছিলেন, আবার মমতা ব্যানার্জীর মতো অনেকে বাতিল নোট আরো কিছুদিন চলতে দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল কেন্দ্র গৃহীত সিদ্ধান্তে অনড় এবং অন্য দিকে আমজনতার দুর্ভোগের খবর আসতে শুরু করেছে তখনই সবাই রে রে করে এমন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে যাতে মানুষের সমস্যা আরো বৃদ্ধি পায় এবং সরকার যাতে কোনো ভাবেই নোট বাতিলের কর্মসূচিতে সফল না হয়।

প্রথমদিকে বিরোধীরা হয়তো এজন্যই চুপচাপ ছিল যে কালোটাকার বিরুদ্ধে অভিযানের মতো একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে কালোটাকা আছে বলে মানুষের সন্দেহের মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার আবেদন নিবেদনে যদি সময় বাড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে কালোটাকাকে সাদা করে নেওয়া যাবে। বিপক্ষ জোটের আরো আশঙ্কা, মুদ্রারহিতকরণের সিদ্ধান্তকে মানুষ এতটাই ভালো ভাবে নিয়েছে যে এটা সফল হয়ে গেলে সম্মিলিত বিরোধী জোটের পক্ষেও বিজেপির রাজনৈতিক মোকাবিলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং মানুষের দুর্ভোগের অজুহাতে কালোধনের বিরুদ্ধে এই অভিযানকে আটকাতে পারলে বেঁচে যাবে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা ধনের পাহাড়, সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অস্তিত্বও।

প্রশ্ন হচ্ছে, এত চেষ্টা করেও সম্মিলিত বিরোধী শক্তি মানুষকে প্রভাবিত করতে পারছে না কেন? কোন জাদুতে মানুষ কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য তৈরি হয়ে গেল। এই প্রশ্নের দুটো উত্তর হতে পারে। এক, কালোটাকার বিরুদ্ধে মানুষের এত ক্ষোভ জমে ছিল যে কালোধন বিরোধী অভিযানের অংশীদার হয়ে কোনো কষ্টই আর এখন কষ্ট মনে হচ্ছে না। দুই, মুদ্রারহিতকরণ ইস্যুতে স্পষ্টতই দেশ এখন দুটো শিবিরে বিভক্ত। প্রথম শিবিরে মূলত নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি। আর দ্বিতীয় শিবিরে সম্মিলিত বিরোধী শক্তি। প্রথম শিবির থেকে বিশেষ করে যে বার্তা যাচ্ছে তা হলো দেশ সবার, দেশের হাল পাল্টাতে গেলে সবার অংশীদারিত্ব জরুরি। গত ১৩ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী গোয়ার ভাষণে বলেন, 'আমি সমস্ত জীবন দেশের জন্য সমর্পণ করে দিয়েছি। আপনারা ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র পঞ্চাশটা দিন একটু মানিয়ে নিন।'

তৃণমূলস্তরে গিয়ে কথা বললেই বোঝা যাবে, মানুষ এটা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে কালোটাকার সমান্তরাল অর্থনীতিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষ। এই অর্থনীতির দৌলতে আজ তৈরি হয়েছে পাহাড় প্রমাণ বৈষম্য। এক দিকে সীমাহীন প্রাচুর্য অন্যদিকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মতো নূন্যতম প্রয়োজনের জন্য হাহাকার। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও এই ব্যবধান বেড়েছে বই কমেনি। মানুষের এই ন্যূনতম চাহিদার সমস্যাকে রাজনৈতিক পুঁজি করে, পাইয়ে দেওয়ার সস্তা রাজনীতি করে কালোটাকার পাহাড় জমিয়েছে এক শ্রেণীর রাজনীতিক ও তাদের সহযোগী কিছু সংখ্যক মানুষ। এটাই স্বাধীনোত্তর ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। মানুষের সমস্যাকে ঢাল করে যারা মুদ্রারহিতকরণের সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য পথে নেমেছেন তাঁদের আচরণেও বোধ হয় মানুষ সেই বস্তাপচা রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবিই দেখতে পাচ্ছে। ফলে আমজনতার কাছে নোট বাতিল ইস্যুতে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আসলে নানা ছুঁতোয় নিজেদের কালোধন, হিসেব বহির্ভূত অর্থে নিজেদের দল ও সাম্রাজ্য বাঁচানোর লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়।

দেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় ৭০ বছর। এই ৭০ বছরে আমজনতার প্রাপ্য চুরি করে বেড়ে উঠা কালোধনের শেকড় বর্তমান ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কালোধনের প্রভাব প্রশ্নাতীত। মুদ্রারহিতকরণের সিদ্ধান্তকে নোংরা ক্ষমতার রাজনীতির পাঁকে ডুবিয়ে আজ যে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস হচ্ছে এর নেপথ্যেও যে সেই কালো সাম্রাজ্যের অধীশ্বররা রয়েছে এ ব্যাপারে আমজনতার মনে কোনো সংশয় নেই।

অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, ৫০০ ও ১০০০-এর নোট বাতিল করে কি দেশের কালোধন নির্মূল করা যাবে? কালোধনের কারবারিরা আবার নানা ফন্দি ফিকির করে নতুন করে জাকিয়ে বসবে না তো? দু' হাজারের বড় নোট কি কালোটাকার মালিকদের আরো বেশি সুবিধে করে দেবে না?

আমার মনে হয়, প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যগুলির মধ্যেই এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মুদ্রারহিতকরণের সিদ্ধান্ত অনেক ভাবনা চিন্তা করে, বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ যেমন জনধন যোজনায় আমজনতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা, কালোটাকার মালিকদের সম্পত্তি সাদা করার সুযোগ দেওয়া, আমেরিকা সুইটজারল্যান্ডের মতো বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের ব্যাঙ্ক জমার তথ্য আদানপ্রদানের চুক্তি সম্পাদনের পর গৃহীত একটি ধারাবাহিক পদক্ষেপ মাত্র।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, এগুলি সবই কালোধনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শুরুর দিকের পদক্ষেপ। এই ধরনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রধানমন্ত্রী দেশে কালোধনের বিরুদ্ধে এক স্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইছেন। বিভিন্ন আইন কানুনের পাশাপাশি তিনি সোয়াশো কোটি ভারতবাসীর প্রত্যেককে কালোধনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সৈনিক হিসেবে পেতে চাইছেন। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী কঠিন লড়াই। ক্ষমতাধর রাজনীতিক, আমলা, বাহুবলী, ব্যবসায়ী, উচ্চ আয়ের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পুঁজিপতি মানেই হিসেব বহির্ভূত অর্থের অধিকারী এই বদ্ধমূল ধারণা পাল্টানোর লড়াই। এই সংগ্রাম যে কোনো যুদ্ধের চেয়েও বড় যুদ্ধ। এই লড়াই আসলে দেশের আমজনতার লড়াই, কালো বনাম সাদার লড়াই। এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে দেশের আমজনতাকেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর সূচনা করলেন মাত্র। ■

# ভারতীয় অর্থনীতিতে নীরব ঘাতক চীন

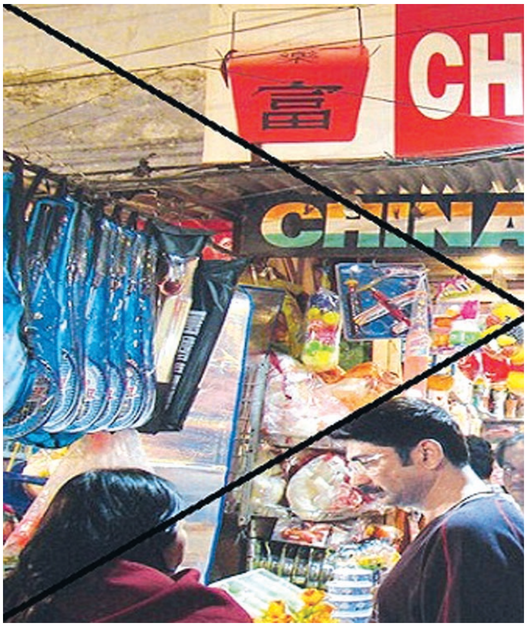


**অম্লানকুসুম ঘোষ**

সাধারণ মানুষের জীবনের শান্তি যেমন অনেকাংশে নির্ভর করে তার প্রতিবেশীদের ওপর, তেমনই কোনো রাষ্ট্রেরও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শান্তি অনেকাংশে নির্ভর করে সেই দেশের প্রতিবেশী দেশসমূহের ওপর। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একথা প্রাসঙ্গিক। ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দেশ হলো চীন। এই চীনের সঙ্গে ভারতের সীমানাও সর্বাধিক। তাই এককথায় বলা যায়, চীন-ই হলো ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিবেশী। নির্দয় বাস্তব হলো এই প্রভাবশালী প্রতিবেশীই রাষ্ট্রচালনার নানা দিকে ভারতকে সমস্যায় ফেলতে সদা তৎপর এবং সে কাজে অন্য প্রতিবেশীকে ইন্ধনও জোগায় নিয়মিত।

রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম প্রধান দিক অর্থনীতিতে চীনের কুপ্রভাব একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চীনের আগ্রাসন মূলত দ্বিমুখী। প্রথম দিকটি হলো ভারতের বাজারকে সস্তা চীনা পণ্যের জোয়ারে ভাসিয়ে দেওয়া। ক্রেতাদের তাৎক্ষণিক লাভ প্রদানকারী এই আপাতসাধারণ বিষয়টি আদতে জাতীয় অর্থনীতিতে ধীর-বিষক্রিয়ার কাজ করে। প্রথমত, সস্তা চীনা পণ্য ভারতের বাজার দখল করে নেওয়ার ভারতীয় পণ্যগুলির বিক্রি বন্ধ হচ্ছে। ফলে ভারতীয় বৃহৎ ও কুটীর উভয় শিল্পই চাহিদার অভাবে ভুগছে। কুটীরশিল্প যেহেতু পুঁজিনিবিড় নয়, তাই এই চাহিদা হ্রাসজনিত আঘাত সহ্য করে টিকে থাকতে পারছে না এবং বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মূলত শ্রমনিবিড় এই শিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রচুর লোক বেকার হয়ে পড়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত বিদ্যানুসারী, হস্তশিল্পের বিশেষ দক্ষতানির্ভর কুটীরশিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে চর্চার অভাবে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের ঐতিহ্য হিসেবে বরণীয় সেই শিল্পগুলির লুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যেমন— বেনারসী শাড়ি। দ্বিতীয়ত, কুটীর শিল্পগুলির মতো অতটা না হলেও বৃহৎ শিল্পগুলিও কিছু পরিমাণে চাহিদা-হ্রাসের মুখে পড়েছে চীনা পণ্যের কারণে। পুঁজিনিবিড় হওয়ায় তার লোকসান হয়তো অতটা হয় না কিন্তু সাময়িক চাহিদা-হ্রাস তাদের বাধ্য করে উৎপাদন হ্রাস ও তজ্জনিত কারণে কর্মী-ছাঁটাই করতে। অর্থাৎ কুটীরশিল্প নির্ভর গ্রাম্যশিল্পী ও বৃহৎশিল্প নির্ভর শহুরে শ্রমিক উভয়েরই একটা বড় অংশ বেকারত্বের মুখোমুখি হয়। অর্থাৎ তাদের উপার্জন হ্রাস এবং ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস হয়। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের কারণে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি যথা— কৃষিক্ষেত্র ও পরিষেবাক্ষেত্র চাহিদা হ্রাসের মুখে পড়ে। ফলস্বরূপ তাদেরও উৎপাদন-হ্রাস করতে হয় ও কর্মী সঙ্কোচনের পথ ধরতে হয়। ফলে আবার চাহিদা-হ্রাস ও অর্থনীতির সবকটি ক্ষেত্রেই পুনর্বার উৎপাদন হ্রাস ঘটে অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতি, বেকারত্ব, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, চাহিদা হ্রাস, উৎপাদন হ্রাস, পুনরায় বেকারত্ব— এইরূপ পতনের এক চক্রে প্রবেশ করে। তৃতীয়ত, এসব চীনা পণ্য সাধারণত ক্ষতিকর কিছু রাসায়নিকের দ্বারা নির্মিত হয় যা দামে সস্তা হলেও পরিবেশের ও ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শুধুমাত্র ব্যবহারকালে নয়, বরং ব্যবহার শেষে ফেলে দেবার পরেও এই বস্তুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে পরিবেশে মিলে যায় না এবং দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশে পড়ে থেকে পরিবেশকে বিষাক্ত করে। ফলে দেশের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয় এবং এর ফলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়, অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকের ও সরকারের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, যে বিপুল পরিমাণ চীনাপণ্য ভারতের বাজারে এসে ভারতীয় অর্থনীতির এত বড় ক্ষতিসাধন করছে, সেই চীনাপণ্য বিক্রিবাবদ প্রাপ্ত অর্থের কী হয়? তার অধিকাংশই ভারতের বাইরে চলে যায়। তবে কোনো বিধিসম্মত পথে নয়, বরং দেশের ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থাকে আঘাত করে Money-laundering পদ্ধতিতেই তা দেশের বাইরে যায়। এর ফলে একদিকে যেমন দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডস্বরূপ ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা আহত হয়, অন্যদিকে সরকার তার প্রাপ্য সমস্তরকম শুল্ক থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সরকারের আয় হ্রাস পায়, ফলে আয়-ব্যয় ঘাটতি (Fiscal deficit) বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে সরকারকে যোজনা খাতে ব্যয় কমাতে হয় যা দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়নকে ব্যহত করে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির সৃষ্টি করে।

দেশ থেকে চীনা পাড়ি দেওয়া এই অর্থের ব্যবহারও হয় তদ্রূপভাবে। এই অর্থের দ্বারাই চীন তার সেনাবাহিনীর জন্য, পাকিস্তানের সেনার জন্য এবং ভারতের অভ্যন্তরে গোলমাল পাকানো মাওবাদীদের জন্য সমরসম্ভার ক্রয় করে। মাওবাদীদের হাতে পড়ে সেই সমরসম্ভারই ভারতীয় অর্থনীতিকে আঘাত করছে। চীনা প্রভাবিত মাওবাদীদের দ্বারা উৎপীড়িত এলাকাগুলি খনিজ সম্পদে ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকা। মূলত ভারতের মধ্যাঞ্চলের ৮০টি জেলা জুড়ে বিস্তৃত

এই এলাকায় রয়েছে ৩০ লক্ষ কোটি টাকার খনিজ সম্পদ, যে সম্পদের সঠিক ব্যবহারে ভারতের অর্থনীতি সম্পূর্ণ নতুন অবয়ব ধারণ করতে পারত কিন্তু চীনা আগ্রাসনে তা হচ্ছে না।

অর্থাৎ শুধুমাত্র সস্তার পণ্য বিক্রি করে এবং পণ্য বিক্রির অর্থকে কাজে লাগিয়ে চীন ভারতীয় অর্থনীতিকে সাঁড়াশি আক্রমণে ফেলেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, তুলনায় এত সস্তা পণ্য নির্মাণ কী করে করছে চীনা উৎপাদকরা? প্রকৃত তথ্য হলো, নিম্নমানের বস্তুগুলি নির্মাণে খরচ কিছু কম হলেও যে দামে এগুলি ভারতের বাজারে বিক্রি হয় তার নির্মাণ খরচ তত কম নয়, অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে উৎপাদন খরচের তুলনায় কম দামে বস্তুগুলিকে ভারতের বাজারে আনা হয় যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় ডাম্পিং বলা হয়। উপরিউক্ত দুটি পদ্ধতিতে বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষতি করা ছাড়াও এই ডাম্পিংয়ের ফলে ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎকে আরও বড় বিপদের মুখে ফেলতে চলেছে চীন। ডাম্পিংয়ের দ্বারা ভারতীয় বাজারে নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করার পর তারা নিজেদের পণ্যগুলির দাম বাড়াবে এবং এই বর্ধিত দাম দিয়েই ভারতবাসীকে তখন সেই বস্তুগুলি কিনতে হবে, কারণ ভারতের শিল্পসমূহ ততদিনে শ্মশানে পরিণত হয়ে যাবে।

ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো যাক। একসময় ইংরেজ শাসনেও ভারত এই অবস্থায় পড়েছিল। ভারত ছিল তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় বাজার আর কাঁচামাল সরবরাহের দাদনদার। আজ চীন চাইছে সেদিনকার পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে। ডাম্পিংয়ের দ্বারা বাজার দখল করে সেই অর্থের দ্বারা অস্ত্র সরবরাহ করে মাওবাদীদের দ্বারা বর্তমান শিল্পনির্ভর যুগের সবচেয়ে বড় কাঁচামাল সমৃদ্ধ এলাকাসমূহ দখল ইংরেজ শাসনেরই বর্তমান প্রতিচ্ছবি।

প্রার্থক্য শুধু এক জায়গায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর অর্থনীতির প্রধান তফাত হলো শক্তির ব্যবহারে ও শক্তির উৎসরূপ জ্বালানি'র ব্যবহারে। বর্তমান বিশ্বের প্রধান জ্বালানি পেট্রোলিয়াম চীন ও ভারত দুই দেশেরই আয়ত্তে নেই, কিন্তু ভবিষ্যৎ বিশ্বের প্রধান শক্তির উৎস আর পেট্রোলিয়াম থাকবে না, হবে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার। সেই অপ্রচলিত শক্তির অন্যতম বড় সূত্র জলবিদ্যুৎ। ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় রাজ্য হলো অরুণাচল প্রদেশ। বছরে এক লক্ষ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির প্রাণভোমরা স্বরূপ এই রাজ্যটির ওপরেও চীনের নজর। আমাদের দেশে পণ্য বিক্রয়বাবদ প্রাপ্য অর্থ দিয়েই তারা তাদের সামরিক বাহিনীকে সমৃদ্ধ করছে অরুণাচল প্রদেশে অনুপ্রবেশ করার জন্য, আমাদের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাকে নির্মূল করার জন্য।

সমস্যা বহুমুখী। সমাধান কোথায়? সরকার নানাবিধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে চীনাদ্রব্য ভারতে প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু চোরাপথে চীনা পণ্যের অনুপ্রবেশের দ্বার বন্ধ করা যায়নি, তাই সমাধান একমাত্র ক্রেতারা। বাজার অর্থনীতিতে বাজারের মূল শক্তি হলো ক্রেতা। বাজারের মূল শক্তিস্বরূপ সেই ক্রেতা ভারতীয় নাগরিকরা যদি নিজ দেশের সম্মান রক্ষায় চীনাদ্রব্য ক্রয় করা থেকে বিরত থাকেন, তবেই চীনা আগ্রাসন বন্ধ করা সম্ভব।

বিপরীতমুখী তিনটি প্রশ্ন এখানে উঠে আসে। প্রথম প্রশ্ন, সস্তা জিনিস কেনার হাতেগরম সুবিধা ছেড়ে ক্রেতারা চীনাপণ্য ক্রয় বন্ধ করবেন কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, মুক্ত-অর্থনীতির এই দুনিয়ায় আমরা চীনাদ্রব্য ক্রয় বন্ধ করলে চীনারাও যদি ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় বন্ধ করে দেয়? তৃতীয় প্রশ্ন, এত বড় ও পরিকল্পিত এক চক্রান্তকে কি শুধুমাত্র সাধারণ ক্রেতারা ব্যর্থ করতে পারবে? উত্তর হলো প্রথমত, চীনা দ্রব্যগুলি দামে সস্তা হলেও মানে নিকৃষ্ট। তাই অল্পদিন ব্যবহারের পরেই ফেলে দিতে হয়।

ভারতীয় দ্রব্যসমূহ দামে বেশি হলেও মানে উন্নত। তাই বারবার ক্রয়ের খরচ করতে হয় না। খারাপ হলে সারিয়ে নেওয়া যায়। সেই কাজে আবার কিছু লোকের কর্মসংস্থান হয়। এছাড়াও চীনাদ্রব্য ব্যবহার করে স্বাস্থ্যহানি হয় ব্যবহারকারীর অর্থাৎ ক্রেতার। তখন স্বাস্থ্যরক্ষায় অতিরিক্ত খরচ সেই ক্রেতাকেই করতে হয়। অর্থাৎ চীনাপণ্য বয়কট করলে ক্রেতাদেরই লাভ।

দ্বিতীয়ত, চীন আমাদের দেশ থেকে নির্মিত সামগ্রী আমদানি করে না, শুধুমাত্র কাঁচামাল আমদানি করে। নিজেদের শিল্প ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই তাই চীনারা ভারতের কাঁচামাল আমদানি বন্ধ করবে না আর করলেও কর্মসংস্থানহীনতাজনিত সমস্যার সম্মুখীন হবে না। তাছাড়াও চীনের থেকে ভারতে বার্ষিক মোট রপ্তানি যেখানে পাঁচ হাজার কোটি ডলার, ভারত থেকে চীনে মোট বার্ষিক রপ্তানি সেখানে মাত্র সাতশো কোটি ডলার, অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বন্ধ করলে চীনেরই ক্ষতি।

তৃতীয়ত, সাধারণ ক্রেতা ঐক্যবদ্ধভাবে কতটা শক্তিশালী তার প্রমাণ মেলে ইতিহাসের পাতায়। আজ থেকে শতবর্ষেরও আগে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না আর ভারত ছিল এক পরাধীন রাষ্ট্র, তখন সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি 'সেট্‌ল্‌ড ফ্যাক্ট' (বঙ্গভঙ্গ)-কে আমরা 'আনসেট্‌ল্‌ড্' করেছিলাম শুধুমাত্র ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের মাধ্যমে। পরাধীন এক দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের পূর্বপুরুষরা যা পেরেছিলেন আজ স্বাধীন ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বের প্রথম সারির এক দেশের নাগরিক হিসেবে আমরাও তা পারবো যদি তাঁদের মতো আমরাও 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে' নিতে পারি। ■

# মধ্যসাম্রাজ্যের মস্তানি

**প্রবাল চক্রবর্তী**

বামপন্থী এক দাদার কথা শুনে সেদিন আমার আক্কেল গুড়ুম অবস্থা। তাঁর বক্তব্য, কাশ্মীরের লোকেরা যখন ভারতে থাকতে চায় না, তখন তাদের মুক্তি দেওয়াই উচিত। আমি বললাম, সে না হয় হলো। কিন্তু লাদাখ আর জম্মুর লোকেরা তো ভারতেই থাকতে চায়। তাদের মতামতের কি কোনো মূল্য নেই? তাছাড়া, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের একটা অংশ গিলগিট-বাল্টিস্তান, সেটা পাকিস্তান দখল করে রেখেছে। সেখানকার লোকেরা পাকিস্তানের শাসন চায় না। আরেকটা অংশ আকসাই চীন, সেটা চীন দখল করে রেখেছে। সেখানকার লোকেরা চীনের শাসন চায় না। ওইসব অঞ্চলের লোকেদের ইচ্ছের কী হবে? শুনে বামুদা রেগে আগুন। বললেন, 'আকসাই চীন' নামেই 'চীন' শব্দটা রয়েছে, তাই চীনই জায়গাটার ন্যায্য মালিক। সেখানকার লোকেরা কী চাইছে, সেটা অবান্তর। বামুদাকে বললাম, আপনাকে উকিল পেলে চীনারা বর্তে যেত। বামপন্থীরা যে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, সেটার জ্বলন্ত প্রমাণ আপনার এই যুক্তি। জানেন কি, 'আকসাই চীন' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'অক্ষয় চিহ্ন' থেকে? এর সঙ্গে চীন দেশটার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনার মতো অনেকেই জানে না, চীনারা নিজেদের দেশটাকে 'চীন' বলে না, বলে 'ঝংগুও'। 'চীন' নামটা সম্ভবত ভারতীয় পরিব্রাজকদের দেওয়া। সেখানেও নামটার উৎস 'চিহ্ন' শব্দটাই। তাই ওই যুক্তিতে চীনের জন্য আকসাই চীন দাবি করাটা পাগলামো।

কর্মসূত্রে পরিচয় হয়েছিল লিংয়ের সঙ্গে। জাতে চীনা। চীন সরকারের অন্ধ ভক্ত। ও বলছিল, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লোকেরা চীনাদের মতো দেখতে, তাই ভারতের উচিত ওইসব অঞ্চলের শাসনভার চীনের হাতে ছেড়ে দেওয়া। লিং-কে বলেছিলাম, বাঙালিদের মধ্যেও বিস্তর মঙ্গোলীয় আদল দেখা যায়। তার মানে কি আমরাও চীনা? একটা দেশের সব নাগরিককে একরকম দেখতে হতে হবে, এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? আমাদের দেবতাদেরও তো একেকজনের গায়ের রং একেকরকম। জাতীয়তার রেশিয়াল ব্যাখ্যাটা আমরা মানি না। তাছাড়া, ভারতের উত্তর-পূর্বের কেউই চীনা 'হান' জাতির নন। আর সেইভাবে দেখলে তিব্বত, উইঘুর ও ইনার মঙ্গোলিয়ার মানুষরাও হান নন। সেই অঞ্চলগুলোকে চীন শাসন করছে কোন যুক্তিতে? উল্টোদিকে হান-রা সবাই মঙ্গোলীয় রক্তের। মঙ্গোলরা এককালে চীন দেশটাকে শাসন করেছে। তাহলে চীন মঙ্গোলিয়ার বশ্যতা স্বীকার করুক না কেন? যুক্তিগুলো লিংয়ের ভালো লাগেনি। সেই থেকে ওর সঙ্গে আমার কথাবার্তা বন্ধ।

ম্যাণ্ডারিন ভাষায় 'ঝংগুও' মানে— 'মধ্যসাম্রাজ্য'। চীনাদের বিশ্বাস, ওদের দেশটা পৃথিবীর ঠিক মধ্যিখানে রয়েছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর চীনা মানচিত্রকার লি ঝি ঝাওয়ের তৈরি পৃথিবীর মানচিত্রে চীনই পৃথিবীর কেন্দ্র হিসেবে চিত্রিত। সেই মানচিত্রেরই পরিমার্জিত সংস্করণ আজ চীনের ক্লাসরুমগুলোর দেওয়ালে ঝোলে। তাই দেখে চীনা ছাত্রছাত্রীরা ভাবে— চীন পৃথিবীর কেন্দ্র, বাকি দেশগুলো চীনের লেজুড়। চীনাদের 'হান' জাতিই পৃথিবীর প্রধান জাতি, বাকিরা সব লেজুড়বিশেষ। মধ্যসাম্রাজ্য হওয়ার অধিকারে চীনই পৃথিবীর যোগ্যতম শাসক।

পৃথিবীতে সভ্যতার প্রসারে চীনের ভূমিকা কতটা? আধুনিককালে ইউরোপের দেশগুলোই পৃথিবী জুড়ে সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছে। আর আগের যুগটা ছিল ভারতের। ভারতীয় শ্রমণরা তথাগতের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন চেনা পৃথিবীর সর্বত্র। তার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতীয় কৃষ্টি, মার্শাল আর্ট, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা। মঙ্গোলিয়া থেকে জাপানে, আরব থেকে শ্রীলঙ্কায় আজও ছড়িয়ে রয়েছে সেইসব প্রচারকদের পদচিহ্ন। তথাগতের আগের যুগটাও ভারতেরই ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে ভারতীয় ধাঁচের বর্ণমালার প্রচলন তারই দ্যোতক। সেখানকার লোকেরা আজও ভারতের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তাই যদি মেনেও নিই— চীন পৃথিবীর কেন্দ্র, সেটা চীনাদের ব্যর্থতাই দেখাচ্ছে। সবচেয়ে সুবিধেজনক অবস্থানে থেকেও বিগত ক'হাজার বছরে পৃথিবীর ওপর চীনের প্রভাব সামান্যই পড়েছে। এর কারণ খোঁজার চেষ্টা চীন আজও করে না। চীন 'সফ্‌ট স্কিল'-এ বিশ্বাস করে না। বন্দুকের নলই ক্ষমতার একমাত্র উৎস, এটা ওদের স্থির বিশ্বাস।

চীন আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মস্তান। একদিকে আন্তর্জাতিক নিয়মের দোহাই দিয়ে এনএসজি-তে ভারতের প্রবেশ বন্ধ করে, অন্যদিকে সাউথ চায়না সী নিয়ে আন্তর্জাতিক কোর্টের রায় যখন ওদের বিরুদ্ধে যায়, সেই রায় গা-জোয়ারি করে অগ্রাহ্য করে। জম্মু-কাশ্মীর ও অরুণাচল প্রদেশকে ওরা ভারতের অঙ্গ বলে মানে না। উল্টোদিকে ওরা তিব্বত, উইঘুর, ইনার মঙ্গোলিয়া দখল করে গায়ের জোরে। তিব্বতকে টুকরো টুকরো করে সীমান্তের টুকরোগুলো বিলিয়ে দিয়েছে

ফা-লুন-দাফা'র প্রতিবাদ আন্দোলন

প্রতিবেশী চীনা রাজ্যগুলোকে। দলে দলে চীনা অভিবাসীতে ছেয়ে যাচ্ছে তিব্বত। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা খুইয়ে তিব্বতিরা আজ নিজভূমে পরবাসী। খুন হচ্ছেন তিব্বতি মঠাধীশরা, ধ্বংস হচ্ছে মঠগুলো। গোটা হিমালয়ের ওপরই চীনের নজর। ওদের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, চীন উপসাগর ও মালাক্কা প্রণালীতে। হান রক্তের গর্বে গর্বিত চীনা শাসকরা হান জনগোষ্ঠীকেও যে খুব আরামে রেখেছে, এমনটা নয়। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ— ফালুন দাফা। জিংয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মেলবোর্নের রাস্তায়। ওর মা ছিল ফালুন দাফার সদস্য। শুনেছি, সরকারি মিডিয়ায় যখন ফালুন-সম্প্রদায় সম্পর্কে কুৎসা রটনা হোত, ওর মা একলা বসে কাঁদতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রতিবাদী ধরনায় বসেছিলেন ওর মা। তার ঠিক এক মাস পর, এক মাঝরাতে তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। কিছুদিন পরে মৃতদেহ ফেরত এল---বীভৎস, বিকৃত অবস্থায়। কিডনি, হার্ট, লাংস, লিভার— সব খুলে দেওয়া হয়েছে।

**ফালুন দাফা :** ম্যান্ডারিন ভাষায় 'ফালুন দাফা' মানে— ধর্মচক্রের অভ্যাস। এদের নীতি— সততা, মমতা, আত্মসংযম। এ এমন এক সংগঠন, যার কোনো চাঁদা, কোনো সদস্যপদ নেই। কোনো ফর্মালিটি নেই, সবটাই ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন থেকে পুরোপুরি আলাদা এদের সংগঠনের চরিত্র। প্রতিষ্ঠা ১৯৯২ সালে। প্রতিষ্ঠাতা লি হংজি। সময়টা চীনের জনগণের জন্য ভালো ছিল না। একদিকে পার্টির একনায়কতন্ত্র, অন্যদিকে লাগামছাড়া শিল্পায়ন ও নগরায়ণ। মাসের পর মাস ছুটি ছাড়া কারখানায় কাজ। কারখানার দূষণে অসুস্থ হয়ে পড়লেও কোনো ক্ষতিপূরণ, কোনো ন্যায়বিচার নেই। সমাজে চরম শ্রেণীবিভাগ। প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আশেপাশের কিছু লোককে ঠকিয়ে, শোষণ করে আরেকটু বড়লোক হওয়া। মানসিক চাপে বিপর্যস্ত জনগণের মধ্যে রোগ আর আত্মহত্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিত্যদিনের সমস্যা। লি হংজি ঠিক করলেন, সাধ্যমতো সবাইকে সাহায্য করবেন। চীনের বিভিন্ন শহরে, পার্ক বা খেলার মাঠে নাগরিকদের একত্রিত করে বৌদ্ধধর্মভিত্তিক বিশেষ এক পদ্ধতির ব্যায়াম ও ধ্যান শেখানো শুরু করলেন। দলে দলে চীনারা যোগ দিতে শুরু করল। একটা সময় দেখা গেল, চীনে প্রতি বারোজনে একজন ফালুন-দাফার সদস্য। সেই সাংগঠনিক শক্তিতে ভয় পেয়ে চীন সরকার রাতারাতি ওদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। সেই শুরু। ফালুন সদস্যদের বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে খুন করা এখন নিত্যদিনের ব্যাপার। তাদের জ্যান্ত শরীর থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির অসুস্থ নেতাদের চিকিৎসায় কাজে লাগানোর গালভরা নাম— 'ভলান্টারি অর্গান ডোনেশন'।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শত অত্যাচারেও ফালুন দাফা-কে শেষ করা যায়নি। আজও এর সদস্যরা ছড়িয়ে রয়েছে চীনের অভ্যন্তরে, চীনের বাইরে— পৃথিবী জুড়ে। যারা চীনের ভেতরে আছে, তারা গোপনে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যারা বাইরে আছে, তারা বেছে নিয়েছে প্রচারের দায়িত্ব। নিয়মিত তারা পার্কে পার্কে দলবদ্ধভাবে ফালুন দাফার ব্যায়াম করে। মিছিল করে, পথনাটিকা করে, প্যামফ্লেট বিলি করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কীভাবে ফালুন-সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার করছে, সে কথা পৃথিবীকে জানানোর চেষ্টা করে।

ক'মাস আগের কথা। অফিসে লাঞ্চের সময় বেরিয়েছিলাম। দেখি, পথের ধার দিয়ে একদল মানুষ কুচকাওয়াজ করতে করতে যাচ্ছে। হাজারখানেকের ওপর নারীপুরুষ বাচ্চাবুড়ো। সবাই চীনা-বংশোদ্ভূত। সবার পরনে ইউনিফর্ম। মিছিলের সামনে ব্যানার, 'ফালুন দাফা ইজ গুড'। পেছনে নীল-সাদা ইউনিফর্ম, ব্যায়াম করতে করতে চলেছে। মিছিলের মাঝে-মাঝে চলমান পথনাটিকা। দৃশ্যগুলো বীভৎস। চীনের লালফৌজ কয়েকজন সাধারণ মানুষকে বেঁধে পেটাচ্ছে, দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছে ফাঁসিকাঠ থেকে। ডাক্তাররা জীবন্ত মানুষের শরীর থেকে কিডনি লিভার হার্ট কেটে নিচ্ছে। জানলাম, সারা পৃথিবী জুড়েই ফালুন দাফার সদস্যরা এভাবে ওদের ওপর চীনা কমিউনিস্ট

পার্টির অত্যাচারের প্রতিবাদ করে।

একবিংশ শতকে সবচেয়ে বেশি কোন দেশের জনগণ দেশত্যাগ করেছে? উত্তরটা সম্ভবত— চীন। আমার নিজের চোখে দেখা, মেলবোর্নের ডনকাস্টার থেকে ক্লেটন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গত পাঁচ বছরে বাড়ির দাম বেড়েছে তিনগুণ। খরিদ্দাররা সবাই চীনা। শুনছি, চীনারা পাগলের মতো বাড়ি কিনছে এখানে। বিক্রেতা যা দাম চাইছে, রাজি হয়ে যাচ্ছে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, ওরা যে-কোনো মূল্যে ওদের দেশ ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। কিছুদিন আগে আলাপ হলো দাইয়ু'র সঙ্গে। অবস্থাপন্ন বাবা-মা'র একমাত্র মেয়ে, চীনের 'এক সন্তান' নিয়মানুযায়ী। বাবা লেখাপড়া করতে পাঠিয়েছে এদেশে, সঙ্গে এদেশে বাড়িও কিনে দিয়েছে। দাইয়ু এখন জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছে, এদেশের নাগরিকত্ব পেতে। গোটা অস্ট্রেলিয়াই চীনা ছাত্রছাত্রীরা এইভাবে ঘাঁটি গাড়ছে। যদি চীনের ভালো-মন্দ কিছু ঘটে, তবে প্রথম ফ্লাইট ধরেই এদের বাবা-মা'রা পালিয়ে আসবে অস্ট্রেলিয়ায়, এটাই নাকি প্ল্যান। প্রশ্ন জাগে, এত বিশাল সংখ্যায় চীনারা চীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে এতটা শঙ্কিত কেন?

কথায় বলে, অতি চালাকের গলায় দড়ি। চীন গোটা দেশের ওপর একটা ভাষাকে চাপিয়ে দিয়েছে, ভারত সেটা করতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছে। আজ তাই ভারতে অসংখ্য ভাষা ফুলে ফলে পল্লবিত। ছোটবেলা থেকে এতগুলো ভাষা শিখতে শিখতে ভারতীয় বাচ্চাদের মস্তিষ্ক এমনভাবে তৈরি হয়ে যায় যে বড় হয়ে জার্মান জাপানি আরবি কোনো ভাষা শিখতেই অসুবিধে হয় না। তার জোরে সারা পৃথিবীতে ভারতীয় অভিবাসীদের অবাধ গতি। উল্টোদিকে চীনাদের সারা জীবন কেটে যায় শুধুমাত্র ইংরেজি শিখতে। চীন 'এক সন্তান' নীতি কড়া হাতে রূপায়িত করেছিল। তার ফলে এখন চীনে দ্রুত কমছে যুবকদের সংখ্যা, বাড়ছে অবসরপ্রাপ্ত বয়স্কদের সংখ্যা। সেখানে ভারতের অধিকাংশ নাগরিকের বয়স ত্রিশ বছরের নিচে। প্রতি বছর লক্ষ যুবক-যুবতী নতুন স্বপ্ন নিয়ে নবীন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কর্মক্ষেত্রে। এই তুলনাটা আরো বহু ক্ষেত্রেই চালিয়ে যাওয়া যায়।

চীনের 'ভুতুড়ে শহর'গুলোর কথা শুনেছেন? সেদেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালরা খামখেয়ালের বশে চাষিদের জমি কেড়ে নিয়ে একটার পর একটা শহর তৈরি করেছে। কোনোটা প্যারিসের ধাঁচে, কোনোটা নিউইয়র্কের। বিরাট রাস্তা, আকাশছোঁয়া বাড়ি, শপিং মল, সবই আছে, নেই শুধু মানুষ। কোটি কোটি বিয়েনের শ্রাদ্ধ করে তৈরি এসব পাগলামোর শহরে কেউই থাকতে আসেনি। দিনে শহরগুলো দেখে মনে হয় জৈবযুদ্ধে বিধ্বস্ত জনপদ। রাতে মনে হয়, অসংখ্য প্রেত কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাস ফাঁকা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে হাহাকার করে বেড়ায়। রাস্তায় ওড়ে আবর্জনার প্ল্যাস্টিক। ভুতুড়ে শহরগুলোকে ভূতেরাও বর্জন করেছে। জনসাধারণকে অঢেল ঋণ দিয়ে এইসব জায়গায় বাড়ি কিনতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। যারা টাকা ঢেলেছিল, পথে বসেছে। চীনের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের পুঁজি ধ্বংস হয়েছে এরকম সব অর্থহীন প্রকল্পে। অনেক শহরেই সরকার বহুতল বাড়ির ছাদে যাওয়ার রাস্তা আইন করে বন্ধ করে নিচ্ছে। যাতে সর্বহারা ঋণগ্রস্ত মানুষগুলো জীবনজ্বালা জুড়োতে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে না পারে। তাতে যে সরকারের বদনাম হয়!

চীনের আজকের পরিস্থিতি দেখলে ভয় হয়। একদিকে লোকে না খেতে পেয়ে মরছে, অন্যদিকে পার্টির নেতাদের সন্তানসন্ততিরা বিদেশে টাকার গদিতে শুয়ে পৃথিবীর সুখভোগ করছে। অধিকাংশ শিল্পশহরে পরিবেশ দূষণ ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। গ্যাসমুখোশ না পরে বাইরে বেরোলে লাং ক্যান্সার অবধারিত। কে আটকাবে এই দূষণ? কারখানা যাদের, তারাই পার্টির নেতা, তাদের হাতেই প্রশাসন, ট্রেড ইউনিয়নগুলোও তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। ভেজাল বেবিফুড খেয়ে যখন লক্ষ লক্ষ শিশু পঙ্গু হলো, মারা গেল, ভাগ্যের মার বলে মাথা পেতে নিল জনগণ। বেবিফুডের কারখানার মালিকও তো নেতারাই! আত্মসমীক্ষার বালাই নেই। চীন আজ উঠে পড়ে লেগেছে ভারতের অগ্রগতি রুখতে। কূটনীতিক গাজোয়ারি থেকে সরকারি মুখপত্রে গালাগালি, কোনোটাই করতে পিছপা হচ্ছে না। কারণ চীন জানে, একমাত্র ভারতই পারে চীনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে, চীনের বিশ্বজোড়া বাজারকে দখল করতে। আরো একটা কারণে ওরা শঙ্কিত। চীন তার যাবতীয় খনিজতৈল আমদানি করে ভারত মহাসাগরের জলপথ দিয়ে। সে জলপথ ভারতের তাম্বরম্ সামরিক বিমানবন্দর থেকে বেশি দূরে নয়। যে কোনোদিন চীনের মস্তানি বন্ধ করে দিতে পারে ভারত, ওই জলপথ বন্ধ করে দিয়ে। খনিজতৈলের অভাবে চীনের প্রগতির রথচক্র থেমে যাবে অনতিবিলম্বে।

যে চীন দুনিয়ার লোককে গালভরা জ্ঞান দিয়ে বেড়ায়, সে নিজের দেশে জীবন্ত মানুষের শরীর থেকে প্রত্যঙ্গ কেটে নেয়। অহিংস সত্যাগ্রহীদের পিষে ফেলে ট্যাঙ্কের নিচে। সবই গরিব মানুষের মুক্তিদাতা কমিউনিস্ট পার্টির দয়ায়। সবই মেহনতি মানুষের মুক্তিফৌজ লালফৌজের কল্যাণে। বৈভব ও সামরিক শক্তিতে চীন আজ অগ্রণী। সেই শক্তিকে ওরা কীভাবে ব্যবহার করছে, ভবিষ্যতে কীভাবে করবে, সেই ভয়ে শঙ্কিত হবার সময় এসেছে। যারা নিজেদের দেশবাসীর ওপর এত অত্যাচার করতে পারে, তাদের হাতে বিশ্বের কী হাল হবে? চীন যদি তার কাঙ্ক্ষিত বিশ্বব্যাপী মস্তানির সাম্রাজ্য তৈরি করতে পারে, মানবসভ্যতার জন্য তা চরম সর্বনাশ ডেকে আনবে। দুঃখের বিষয়, পৃথিবী আজও চীনকে ন্যায্য প্রশ্নগুলো করতে ভয় পায়। কলকাতায় আর তিরুঅনন্তপুরমে লালমার্কা নেতা আর বুদ্ধিজীবীরা বেজিংয়ে বৃষ্টি পড়লে সহমর্মিতায় নিজেদের মাথায় ছাতা ধরেন। পাশ্চাত্যের সভ্য জগৎ ভিড় করে ফালুন দাফার মিছিল দেখে, তাদের পথনাটিকা দেখে আহা-উহু করে, তারপর বেমালুম সব ভুলে নিজেদের পকেটের টাকা খুইয়ে বলীয়ান করে স্বৈরাচারকে। সস্তার ঠুনকো চীনা পণ্য কিনে ঘর বোঝাই করে। যে পণ্যে লেগে আছে শ্রমিক-কৃষক- মেহনতি মানুষের রক্ত, ফালুন দাফার সদস্যদের রক্ত। সে রক্ত দেখেও দেখে না লোকে। কেউ চীনকে ডেকে প্রশ্ন করে না— রাজা, তোর কাপড় কই?

*(লেখক প্রবাসী ভারতীয়, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া)*

# চিঠিপত্র

## মোদীজী কী খেলাই না দেখালেন

অন্তত আমার জীবনকালে এরকমটি দেখিনি। কালোটাকা নিয়ে কী অভূতপূর্ব সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করলেন মোদী। মোদীজীর জবাব নেই। পূর্বাভাস না দিয়ে রাতারাতি ৫০০ ও ১০০০ টাকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ফলে, বস্তাবন্দি কালোটাকা ইঁদুরের খাবার হিসেবে ফেলে রাখা অথবা পুড়িয়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। কাজেই ধনী কাঁদছে। টাকার শোক পুত্রশোকের চেয়েও অধিক।

মাফিয়া কাঁদছে, প্রমোটার কাঁদছে, তোলাবাজ কাঁদছে, অনুমান, কতিপয় নেতা-মন্ত্রীও হয়তো কাঁদছে। অথচ এই কান্নার শব্দ নেই। ভাষা নেই। অশ্রু নির্গমনের উপায় নেই। এই কান্নার কী যে জ্বালা যে কাঁদে সেই জানে। উৎপীড়কের এই নিরুপায় কান্না দেখে গরিব হাসছে। গরিব হাসছে আরও একটা কারণে। কিছু কিছু কালোটাকার দালাল তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাতে পায়ে ধরছে কালোটাকা সাদা করে দেওয়ার জন্য। দু-এক লক্ষ পুরোনো টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে জমা করে পরে তুলে দিলেই শতকরা ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ কমিশন।

১০০ দিনের কাজে শ্রমিকদের কাছ থেকে যারা কমিশন খেয়ে খেয়ে কালোটাকার পাহাড় জমিয়েছে, তারাই এখন শ্রমিকদের পায়ে তেল মাখিয়ে অনুনয়ের স্বরে বলছে, 'তোদের অ্যাকাউন্টে আমার টাকাগুলো জমা করে দে। মোটা অঙ্কের কমিশন দেব।' সত্যি মোদীজী কী খেলাই না দেখালেন।'

—**অশোক কুমার ঠাকুর,**
কোচবিহার।

## নোট বাতিল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কালোটাকা উদ্ধার এবং জাল টাকার কারবার রুখতে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের ঘোষণাকে আমাদের দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ সাধুবাদ জানালেও একশ্রেণীর মানুষ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে জনগণের দোহাই দিয়ে রাজপথে, সংসদে সোচ্চার হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামেগঞ্জেও জনগণকে খেপিয়ে তোলার সবরকমের চক্রান্তও করছে।

প্রধানমন্ত্রীকে আমার অনুরোধ, দেশের এই নির্লজ্জ রাজনীতিকদের মুখোশ খুলে দেওয়ার চেষ্টা আপনাকেই করতে হবে। আমাদের দেশ বর্তমানে এমন একজায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, ভাল কাজ করলেই সমস্যা। শাস্ত্র বলছে, কলিযুগে ধর্মের পথেই কম লোক। সুতরাং ধর্মযুদ্ধে জয়ী হতে হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো কূটকৌশল অবলম্বন ব্যতীত জয়ী হওয়া কখনই সম্ভব নয়। করে-কম্মে খাওয়া রাজনীতিকরা নিজের উদরপূর্তি নিয়েই এখন ব্যস্ত। তাই সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ রাজনীতিক হিসাবে আপনাকে কঠোরভাবেই এর মোকাবিলা করতে হবে। কারণ অসৎ রাজনীতিকদের হাতে পড়লেই দেশ বিপন্ন হবে। তাই সাধারণের যাতে কোনো ভোগান্তি না হয়, সৎ মানুষের যাতে কোনো সমস্যা না হয়, তার জন্য ৫০০ এবং ১০০০ টাকার জোগান বাড়ান। এটিএমগুলো একশো শতাংশ সচল করার ব্যবস্থা করুন। ব্যাঙ্ক-পোস্টঅফিস থেকে যেন সৎ এবং সাধারণ মানুষ তার প্রয়োজন মতো টাকা পায় তার ব্যবস্থা করা হোক। অপরদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরনো নোট নেওয়ার প্রক্রিয়া জারি রাখা হোক নতুবা এই মুহূর্তে বেশি টাকার লেনদেন বন্ধ করা হোক। পুরনো নোট নেওয়ার প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত করা হোক। সেইসঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্বলতাগুলিকে বেশি করে প্রচার করা হোক।

—**বারিদবরণ বিশ্বাস,**
মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

## নতুন নোট ও জনগণ

সম্প্রতি মোদী সরকারের ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সব থেকে সেরা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত কালোবাজারি ও জালনোটের কারবারিদের কপালে চিন্তার ভাজ ফেলে দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় আমাদের দেশের কিছু বিরোধীদলও রাস্তায় নেমেছে। এ তো গেল ওপর তলার মানুষের কথা।

এইবার আসি জনগণের প্রতিক্রিয়ার কথায়। একথা ঠিক যে মানুষের কিছু দুর্ভোগ হয়েছে। যেমন পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি করতে গেলে বাড়ির বাসিন্দাদের সাময়িক কষ্ট হয় কিন্তু নতুন বাড়ি হওয়ার আনন্দে মানুষ সেটা মেনে নেয়, জনগণের প্রতিক্রিয়াও এক্ষেত্রে তাই। হোক প্রতিবাদ পোস্টার পড়লেও কিন্তু প্রতিবাদ হয়নি সাধারণ মানুষের দ্বারা। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েও জনগণ মোদীর নাম করেছেন। ধৈর্যের সঙ্গে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা তুলেছেন। জনগণের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে বোঝা যায় সাম্প্রতিক উপনির্বাচনের ফলাফলে। অসম, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে বিজেপির ফল প্রমাণ করে জনগণ মোদীজীর সিদ্ধান্তে কতটা আস্থা রেখেছেন। আর যে রাজ্যে প্রতিবাদের পোস্টার পড়েছে সেখানেও কিন্তু একটি লোকসভায় বিজেপি দ্বিতীয় হয়েছে। বিজেপির প্রাপ্ত ভোট কিন্তু অন্য বিরোধী দলের নিরিখে যথেষ্ট ভালো। এই ফল কিন্তু প্রমাণ করে জনগণের প্রতিক্রিয়া। তাই নেতারা যাই বলুন না কেন জনগণ মোদীজীর নেতৃত্বে দুর্নীতিমুক্ত ভারতের স্বপ্নই দেখেন।

—**রাহুল চক্রবর্তী,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

## প্রসঙ্গ তিন তালাক

সম্প্রতি তিন তালাক প্রসঙ্গে তানভীর নাসরিনের একটি নিবন্ধ বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে এই চিঠি।

তানভীর নাসরিন আপনার এত দুঃসাহস? সৈয়দ তানভীর নাসরিন আপনি এত দুঃসাহসী হলেন কী করে? আপনি নিশ্চয়ই সেকুলার এবং লিবারেল নন। আপনি নিশ্চয়ই আর এস এসের দালাল। নিশ্চয় আপনি কট্টর ভারতপন্থী? আপনি নিশ্চয় সাম্প্রদায়িক। আপনি কি জানেন না তিন তালাক নিয়ে এই একবিংশ শতকেও প্রশ্ন তোলা যায় না। আপনি কি জানেন না, শরিয়ত আইন স্বয়ং হজরত মহম্মদের নির্দেশে রচিত নয়, হজরত-পরবর্তী চারজন ধর্মগুরুর নির্দেশে রচিত। আপনি কি জানেন না, স্বয়ং খোদাতাল্লাকে পৃথিবীর জায়গির দিতে নিরীহ তৃণভোজী গোরু ভক্ষণের (কোরান, সুরা বক্‌বা, ২য়/৫১ আয়ত-সুরা নেশা/১১৯), ২০ (৯০) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপনি কি জানেন না, মধ্যপ্রাচ্যের গোষ্ঠী সংঘর্ষের হানাহানিতে হাজার হাজার পুরুষ নিধনে (আকাল) বাড়ন্ত নারীকে সমাজে জায়গা দিতে এক পুরুষের চার নিকাহ'র বন্দোবস্ত যা আজকের পৃথিবীতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ? একজন পুরুষ চারজন বিবি রাখবে এতে নারীর আবার অবমাননা হয় নাকি? আর হলোই বা, যদি নারীর শারীরিক, মানসিক, আর্থিক চাহিদার ঘাটতিতে চরম কোন্দল বাধে 'তালাক তালাক তালাক' কোরান ২(২২৭, ২২৮, ২৩০, ২৩২, ২৪১)৩৩ (৪৪৯) ৫৮(২), ৬৫(১), কাফ্‌ফরা'র ৫৮ (২,৩) মতো অদ্ভুতুড়ে সমাধান আছেই। আপনি কি জানেন না, অশিক্ষাই নারীর স্বাধীনতার অন্তরায়? আপনি কি জানেন না, আল্লার ইচ্ছেই পুরুষ মানুষের দুঃসময় বা ক্রোধ আসে না। আর এলেই বা দোষ কী? বলির পাঠা হবার জন্য নারী তো রয়েছেই। আরে বাবা, নারী হয়ে জন্মেছো এটুকু যন্ত্রণা তো আল্লার ইচ্ছায় তোমাকে হাসি মুখে সহ্য করতে হবে! তুমি নারী, তোমার আবেগ ভাব-ভালোবাসার স্থান আছে নাকি? তুমি সন্তান জন্ম দেবার কারিগর, গণ্ডায় গণ্ডায় সন্তান জন্ম দাও তাহলেই বেহেস্তে তোমার জায়গা একেবারে পাক্কা। তাতে হাসপাতালে যত লম্বা লাইন পড়ে পড়ুক। তোমার, তোমার সন্তানের রোগ শোক তো আল্লা দেখবে। দুর্মুখেরা তো বলবেই, 'হাসপাতালে সবচেয়ে মুসলমানদের ভিড় বেশি'। তানভীর নাসরিন আপনি যত বড়ই প্রফেসর হোন না কেন, ধিক্ আপনার শিক্ষা। তাই বলে নারী গাড়ি চালাবে? স্কুল কলেজে যাবে? খেলার মাঠে ল্যাংটো পোশাক পরে দৌড়ঝাপ করবে? তিন তালাক মানবে না? এ কি কোনো সভ্য দেশে চলে?

তানভীর নাসরিন আপনাকে দেখে ভয় হয়? আপনি না তসলিমা নাসরিন হয়ে যান? আপনি না মালালা ইউসুফজাই হয়ে যান? আপনি না সুস্মিতা (কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ)-দের মতো হয়ে যান। কোন এক খোমেইনি অথবা বকল্‌মা মধ্যযুগীয় উচ্চশিক্ষিতের 'গর্দান- ফতোয়া'য় আপনি কিন্তু কাউকেই পাশে পাবেন না। না আপনার সাধের ভারতবর্ষের নেতা-নেত্রী, মন্ত্রী, আমলা, প্রশাসন, প্রতিবেশী, না আপনার ভাইজান অথবা ফুফা আপনার কবরে মাটি দেওয়ার জন্য দোজখে বসে কাউকে দেখতে পাবেন না।

—**সুভাষ মোহান্ত,**
বারাসাত, কলকাতা-১২৪।

# রাজপুতানা—রাজস্থান নামের নেপথ্যে

সাধারণভাবে বলা হয়, রাজাদের দেশ রাজস্থান। তবে সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় রাজপুত রাজাদের দেশ রাজস্থান। বিষয়টি নিয়ে সহজ আলোচনা করা যাক।

প্রাচীনকালে রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন— কুরু জাঙ্গলা, মাদ্রেয় জাঙ্গলা, কুরুদেশ, মৎস্য, শিবি, মেঝড়, মালব, মারওয়ার্ড, গুর্জরাত্রা, শেখাবাটী ইত্যাদি।

উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয় আনুমানিক ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে। ঐতিহাসিকদের মতে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর রাজপুত যুগ শুরু হয়। স্মরণীয় রাজপুত যুগ শুরু হওয়ার আগেই বিদেশি ইন্দো-গ্রিক, শক, কুষাণ, হূন ইত্যাদি জাতির আধিপত্য বা সাম্রাজ্য ভারতে স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। এরূপ বিদেশি শাসক বা রাজাদের সঙ্গে দেশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠায় রক্তমিশ্রণ ঘটতে থাকে। আবার হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আরবরা আঘাত করতে শুরু করে। এই অবস্থায় আরব আক্রমণ এবং রক্তমিশ্রণ রোধের জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় রাজবংশের প্রতিহার, চৌলুক্য, চৌহান ও পরমাররা বিখ্যাত আবু পাহাড়ে একটি সম্মেলন আয়োজন করেন। এখানে ক্ষত্রিয় বংশীয়রা প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁরা একজোট হয়ে বিদেশি আক্রমণ রোধ করবেন এবং রক্তশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট কিছু বংশে ও নির্দিষ্ট অঞ্চলে (মূলত রাজস্থান) সীমাবদ্ধ রাখবেন। এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক্ষত্রিয়রা রাজপুত্র বা রাজপুত নামে পরিচিত হন। এই রাজপুত শক্তি প্রায় সাড়ে পাঁচ শতক ধরে মুসলমান শক্তিকে প্রতিরোধ করে রাখে। অবশেষে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে পৃথ্বীরাজ চৌহান মুহম্মদ ঘুরির নিকট পরাজিত ও নিহত হন। রাজপুত যুগের পতন শুরু হয়। মোগল যুগে যুদ্ধ আর বোঝাপড়ার মাধ্যমে রাজপুতরা রাজকার্য করেন। ব্রিটিশ যুগে চুক্তির মাধ্যমে রাজ্য শাসন করেন।

উল্লেখ্য, মোগল ঐতিহাসিকরা রাজপুতদের বহুবচনে রাজপুতা বলতেন। রাজপুতা কথাটি ইরেজিতে রাজপুতানা হয়ে যায়। রাজপুতানায় ছোট ছোট রাজ্যকে রাজথান বা রায়থান বলা হোত। যতদূর সম্ভব রাজথান নামের অনুকরণে বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ঐতিহাসিক কর্নেল জেমস্ টড তাঁর রচিত--- 'এনালস অ্যান্ড এন্টিকুইটিজ অফ রাজস্থান' গ্রন্থে প্রথম 'রাজস্থান' নামটি ব্যবহার করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পর রাজপুতানার নাম হয় রাজস্থান।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

পরম্পরা

# লিঙ্গ উপাসক আফগানিস্তান

সন্দীপ চক্রবর্তী

কৌরব পক্ষের যেসব লোকজন মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, যুদ্ধের পর তারা সবাই গান্ধারে চলে গিয়েছিলেন। গান্ধার তখন ভারতবর্ষেরই একটি স্বাধীন অঙ্গরাজ্য। স্বয়ং গান্ধারী সেখান থেকে হস্তিনাপুরে এসেছিলেন। সেই সুবাদে কৌরবদের কাছে গান্ধার ছিল খুবই আপন। এছাড়া আরও একটি কারণে শিবের উপাসক কৌরবদের কাছে গান্ধারের আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। সে যুগেই গান্ধার শিবক্ষেত্র হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করেছিল। গান্ধারী তাঁর শতপুত্রের বর পেয়েছিলেন শিবের কাছ থেকে। পরবর্তীকালে অবশ্য গান্ধার বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিরও পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল।

*আফগানিস্তানের নবম শতাব্দীর একমুখলিঙ্গ।*

কিন্তু সেই গান্ধার আজ কোথায়? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর, তার চিহ্নমাত্র আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখনও পর্যন্ত যা প্রমাণ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, আজকের কান্দাহার ছিল সে যুগের গান্ধার। আরব সাম্রাজ্যবাদের অপরিহার্য অঙ্গ ইসলাম ধর্মের আগ্রাসন, অত্যাচার এবং নির্বিচার ধর্মান্তরকরণের ফলে গান্ধারের ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি সবকিছুই একরকম ধ্বংস হয়ে যায়। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে আরবের মুসলমানরা ওয়ালাজা, আল-কোয়াদিশিয়া এবং নাহাভান্দের যুদ্ধে অগ্নির উপাসক পারসিকের (পারস্যের অধিবাসী) ধ্বংস করার পর পারস্যের পূর্বদিকে অগ্রসর হয় এবং ৬৫২ খ্রিস্টাব্দে হেরাত শহর দখল করে নেয়। ধীরে ধীরে গোটা আফগানিস্তানই আরব অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে যায়। ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের সৈন্যরা আরবের সৈন্যদের হটিয়ে দিতে সমর্থ হলেও তারা আবার ফিরে এসেছিল। মোটামুটি দশম শতাব্দীর মধ্যে, গজনভি শাসনকালে আফগানিস্তানের প্রাচীন অধিবাসীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়।

এই নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, গান্ধার একসময় শিবক্ষেত্র হিসেবে সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করেছিল। অসংখ্য শিবমন্দির ছিল। সেইসব মন্দিরে সারাদিন শিব ও পার্বতীর পূজার্চনা চলত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ আধিকারিক স্যার এস্টিন প্রথম এই অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে অজস্র মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং মূর্তির খণ্ডাংশ আবিষ্কার করেন। আবিষ্কৃত মূর্তি এবং মুদ্রার ওপর ভিত্তি করে তিনি চারখানি গ্রন্থরচনা করেন। এই অঞ্চল মূলত শিবক্ষেত্র হলেও, সূর্য এবং গণেশের পুজো যে এখানে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ তাঁর গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়।

আফগানিস্তানের অতীত সম্পর্কে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ আলোকপাত করেছেন ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল রহমান। তিনি তাঁর দুটি গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রাচীন অ-ইসলামিক আফগানিস্তানের সমৃদ্ধি এবং গরিমার কথা লিখেছেন। বিশেষ করে কুশম এবং কিদারা নামধারী দুই হিন্দু রাজার প্রজাপালন এবং শাসনের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁদের আমলে শুধু আফগানিস্তানে নয় পশ্চিম এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশে শৈবধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময় উজবেকিস্তান এবং তাকজিকিস্তান ছিল আফগানিস্তানের অঙ্গ। তাসখণ্ড শহরে সে যুগের একটি শিবমন্দির এখনও আছে। অধ্যাপক আবদুল রহমান লিখেছেন, সে যুগে বুখারা অঞ্চল 'শাহ্‌বিহার' নামে পরিচিত ছিল। সেখানকার রাজা ছিলেন একজন হিন্দু। আরব গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাঁর রানি কাশ্মীরের রাজার কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। প্রাচীন আরব গ্রন্থে তাঁকে 'খাতুন' অর্থাৎ অভিজাত মহিলা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে লিখেছেন, কাশ্মীরের হিন্দু রাজা তৎকালীন বাগদাদের আরব খলিফা মামুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। বুখারায় তখন মুসলমান শাসন শুরু হয়ে গেছে। মামুন ভারতের বেশ কয়েকজন হিন্দু ভিষকাচার্যকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁরা চিকিৎসা করে তাঁকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। সেই সময় আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসকদের পশ্চিম এশিয়ায় যথেষ্ট সুনাম ছিল। অনেক আয়ুর্বেদ গ্রন্থ

আরবিতে অনুবাদও করা হয়। ‘আল ফ্রিশত’ নামের একটি সংকলন গ্রন্থে আয়ুর্বেদের একাধিক বিষয় স্থান পেয়েছে।

আজারবাইজানের রাজধানী বাকু প্রাকৃতিক গ্যাস এবং খনিজ তৈলের জন্য বিখ্যাত। বাকুতে এখনও একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির রয়েছে। রাশিয়া যখন জারের শাসনাধীন ছিল তখন একজন পঞ্জাবি পুরোহিত ওই মন্দিরে পূজার্চনাদি করতেন। মন্দিরের দেওয়ালে পঞ্জাবি গুরমুখী ভাষায় অনেক মন্ত্র খোদিত রয়েছে। নিকটবর্তী বাজারে এখনও হিন্দু ব্যবসায়ীদের আধিক্য চোখে পড়ে। শহরের একটি অঞ্চল সম্পূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত। আজারবাইজানি ভাষায় বাকু কথার অর্থ দেবী। অনেকেই অনুমান করেন এক সময় এখানে বৈদিক কোনো দেবীর মন্দির ছিল।

কেন্দুজ আফগানিস্তানের একটি অঙ্গরাজ্য। স্থানীয় ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুযায়ী, কেন্দুজের কোনো এক রাজার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন হিন্দু। পর্যটক আলবেরুনি হিন্দু আফগানিস্তানের সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি খিঙ্গলা নামের এক রাজার কথা লিখেছেন। খিঙ্গলা তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রায় শিবের মূর্তি খোদিত করিয়েছিলেন। এই বংশের প্রথম রাজা ছিলেন বিয়াহিতাঙ্গি। গারডেজ শহরের একটি শিবমন্দিরের কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই মন্দিরটি আরব আক্রমণকারীরা ধ্বংস করেছিল। যাইহোক, বিয়াহিতাঙ্গির রাজবংশ ৬৬৬ থেকে ৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিল। ৮৪৩ থেকে ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন এক ব্রাহ্মণমন্ত্রী। তিনি ছিলেন কালকা সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। সেই সময় কালকা সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। পরবর্তীকালে তারা কেলার সম্প্রদায় নামে পরিচিতি লাভ করেন। পঞ্জাবে এখনও কেলার নামে একটি শহর আছে। এই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদের মধ্যে সামন্তদেব, ভীমদেব, জয়পালদেব, আনন্দপালদেব এবং ত্রিলোচনদেবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১০০২ সালে মহম্মদ গজনবির ভারত আক্রমণকালে তার সঙ্গে যুদ্ধে জয়পালদেব হেরে যান। সেই দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিউয়েন সাঙ ভারতে এসেছিলেন। তিনি কাবুল উপত্যকা অঞ্চলে শাহি খিঙ্গাল নামে এক হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজার নাম লিখে গেছেন। শাহি খিঙ্গালের নাম সেই সময়কার একটি প্রস্তরলিপিতেও পাওয়া গেছে। কাশ্মীর এবং পূর্বের কয়েকটি রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে কাবুলের হিন্দু শাহি বংশের আত্মীয়তা থাকতে পারে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে শৈব আফগানিস্তান কালক্রমে বৌদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু খ্রিস্টান ও ইসলামের উদ্ভব এবং ইউরোপীয় ও আরব সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের গাঁটছড়ার ফলে সারা পৃথিবী আর্তনাদ করে ওঠে। ইসলামি ধর্মবেত্তাদের আড়ালে অপেক্ষমান আরব গেরিলাবাহিনীর ভয়াবহ আক্রমণে গোটা পশ্চিম এশিয়ায় রক্তের নদী বয়ে যায়। আফগানিস্তানের বহু হিন্দুমন্দির এবং বৌদ্ধ মঠ ও সঙ্ঘারাম সেই সময় ধ্বংস হয়।

আরব, তুর্কি এবং মঙ্গোল আক্রমণের ভয়াবহ বিবরণ কিছু কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। আরব সৈন্য আফগানিস্তান আক্রমণ করে ১৫৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রাচীন পারসি গ্রন্থ তারিখ-ই-সিস্তানে বর্ণিত হয়েছে কীভাবে আফগানিস্তানে একটির পর একটি শিবমন্দির লুণ্ঠিত ও ধ্বংস হয়। ইবন-ই-সামুরাহ্ নামের এক আরব আক্রমণকারী একটি মন্দিরের সোনার শিবলিঙ্গ-সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুণ্ঠন করে মন্দিরটি ধ্বংস করে। পরে এই ইবন-ই-সামুরাহ্ কান্দাহারে বহু নিরীহ নরনারীকে হত্যা করে। এছাড়া আব্বাসি খালিফারাও বহুবার আফগানিস্তান আক্রমণ করে। বিশেষ করে কুখ্যাত ঘাতক খলিফা ইয়াজিদের নাম উল্লেখ করতেই হবে। এই ইয়াজিদের জন্যই হিন্দু শাসক রাজা দলহিরের সিন্ধুপ্রদেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। রাজা নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত নন। কিন্তু কাবুল আক্রমণকালে উচিত শিক্ষা পেয়েছিল ইয়াজিদ। সেখানকার হিন্দুরাজা বীরের মতো যুদ্ধ করে ইয়াজিদকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেন।

ড. আবদুল রহমানের গ্রন্থে আফগানিস্তানের হিন্দু রাজাদের প্রতিষ্ঠিত বহু মন্দির এবং প্রবর্তিত মুদ্রার ছবি স্থান পেয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে গারডেজ শহরের মন্দিরগুলির ধ্বংস হয়ে যাওয়া শিব এবং দুর্গামূর্তির ছবিও। তিনি লিখেছেন— শিব, দুর্গা এবং সূর্যের মূর্তিগুলো খুবই সুন্দর। এমন কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে যেখানে সংস্কৃত ভাষায় প্রবর্তনকারী রাজার নাম উৎকীর্ণ। হুডুডের আওক নদীর তীরে হিন্দু রাজাদের তৈরি একটি বিশাল দুর্গ এখনও বিদ্যমান। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে জয়পালদেব, রাজকুমারী রত্নামঞ্জুরী এবং মহারানি কামেশ্বরী দেবীর জীবনকাল ও প্রজাশাসনের কথা জানা যায়।

ইউরোপ এবং আরব একসময় দস্যু ছিল। পরবর্তীকালে খ্রিস্টান এবং ইসলামের উদ্ভব ও তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তির পর তারা দস্যুর পোশাক বদলে সাম্রাজ্যবাদীর পোশাক পরে নেয়। ধর্ম তাদের সহায়ক হয়ে ওঠে। ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের বৈশিষ্ট্যই হলো দখল করা দেশের প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা। আফগানিস্তানে তাই হয়েছে। এক সময় যে দেশে সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি শোনা যেত, সামগানে মুখরিত হয়ে উঠত আকাশ-বাতাস কিংবা তথাগত বুদ্ধের বন্দনা গাইতে গাইতে গৃহস্থের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াতেন বৌদ্ধশ্রমণ—এখন সেখানে বন্দি কাফেরের শিরশ্ছেদনের আর্তনাদ শোনা যায়। পার্থক্যটা স্পষ্ট। ভারতবর্ষ অনেক আগেই পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছিল। তাই মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করেছে কিন্তু সত্তা হারায়নি। ■

# শ্রীচৈতন্যদেব পরিকর শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু

**জনৈক ভক্ত**

শ্রীশ্রী চৈতন্যদেবের পরেই বৈষ্ণব-সমাজে যিনি অধিক পরিচিত তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু। বর্তমানে বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচক্র গ্রামে মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (হাড়াই পণ্ডিত) জ্যেষ্ঠ্য পুত্ররূপে ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন (১৩৯৪ শকাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী)। বর্তমানে একচক্র গ্রামের নাম নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র গোস্বামীর নামে বীরভদ্রপুর হয়েছে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মের পর তাঁর নামকরণ হয় কুবের বন্দ্যোপাধ্যায়। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে এক সন্ন্যাসীর সেবক হিসেবে তিনি গৃহত্যাগ করেন (১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে)। এই সময় তাঁহার নাম হয় নিত্যানন্দ অবধুত। বিভিন্ন তীর্থভ্রমণ করে আনুমানিক ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নবদ্বীপে আগমন করে শ্রী অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ বৈষ্ণব পণ্ডিতের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের (২৬ জানুয়ারি ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে) সময় থেকে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশে তিনি বঙ্গে আগমন করেন এবং নবদ্বীপকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সংসার জীবনে ফিরে আসেন। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে অম্বিকা কালনা নিবাসী সূর্যদাস সরখেলের কন্যা বসুধা দেবীকে বিবাহ করেন। পর বছর বসুধা দেবীর ভগ্নী জাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করেন। জাহ্নবা দেবীর কোনো সন্তান ছিল না। আত্মীয় পুত্র রামাই ও কানাই-কে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেন। বসুধাদেবীর গর্ভে রামচন্দ্র ও বীরভদ্র নামে দুই পুত্র এবং গঙ্গাদেবী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। রামাই, কানাই এবং রামচন্দ্রের বংশধরগণ অম্বিকা কালনায় এবং কলিকাতার চীৎপুরে বসবাস করেন। বীরভদ্র গোস্বামীর বংশধরগণ বর্তমানে খড়দহ এবং নবদ্বীপে বসবাস করেন। গঙ্গাদেবী বিবাহ করেননি।

বর্তমানে খড়দহে শ্যামসুন্দর মন্দির, সাইবানার নন্দদুলাল মন্দির এবং হুগলীর মাহেশের নিকট রাধাবল্লভ মন্দির প্রভু বীরভদ্র গোস্বামী ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। তিনটি মন্দিরের বিগ্রহ একই পাথর কেটে নির্মাণ করা হয়। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে তিন মন্দিরেই উৎসব ও ভক্ত সমাগম হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুপস্থিতিতে বঙ্গে বৈষ্ণব আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ইহলোক ত্যাগ করেন।

উল্লিখিত সমস্ত তথ্য ইতিহাস প্রমাণিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণালব্ধ তথ্য তথা চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল এবং ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও ডাঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতামত থেকে গৃহীত। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

**প্রণব**

পড়ুন ও পড়ান

# পাখির নিঝুম আবাস রসিকবিল

শীতলকাল এলে সবারই মন বেরিয়ে পড়তে চায়। আর সেজন্য সেজে ওঠে বেড়ানোর জায়গাগুলিও। কোচবিহার শহর থেকে ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা রসিকবিল। শহরের শব্দ যন্ত্রণা ও দূষণ থেকে মুক্ত একটি নিঝুম প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রকৃতির কোলে যারা বেড়াতে ভালোবাসে তাদের জন্য আদর্শ জায়গা এই রসিকবিল। সবুজ বানানীর মাঝে পাখিদের আবাস। এটি তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। প্রতিবছর শীত শুরু হতেই পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে এখানে আসতে থাকে নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখির দল। ওয়াচ টাওয়ারে উঠলে চোখে পড়ে তাদের গতিবিধি। কেউ যদি আরো কাছে গিয়ে ছুঁয়ে দেখতে চায় তাহলে তারও ব্যবস্থা আছে। বোট বা নৌকায় করে পৌঁছে যাওয়া যায় পাখিদের ভিড়ে।

রসিকবিলের মূল আকর্ষণ এই পরিযায়ী পাখির দল। শীতকালে পাখিপ্রেমীরা দলে দলে গিয়ে হাজির হয় সেখানে। কেউ ক্যামেরায় চোখ রেখে বসে থাকে ছবি তোলার জন্য, কেউবা মুগ্ধতায় চেয়ে থাকে।

এছাড়াও আছে একটি ঘড়িয়াল সংরক্ষণ কেন্দ্র। সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, ময়ূর, হরিণ, বাঘ এসবের দেখা মিলবে। আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহার দু-জায়গা থেকেই যাওয়া যাবে। সেখানে গিয়ে যদি থাকার ইচ্ছে হয় তাহলে বনবাংলো আছে। তবে আগে থেকে বুক করে যেতে হবে।

# মুকুটমণিপুর ও বিষ্ণুপুর

বাঁকুড়া জেলায় অনেক বেড়ানোর জায়গা আছে। তার মধ্যে দুটি হলো মুকুটমণিপুর ও বিষ্ণুপুর। মুকুটমণিপুরে দর্শনীয় হলো মাটির তৈরি দীর্ঘ বাঁধ, যা জল সংরক্ষণের জন্য

নির্মাণ করা হয়েছে। এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব সুন্দর। বাঁধের জলাশয় ঘিরে রয়েছে ছোট ছোট টিলার মতো পাহাড়। বাঁধের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে খুব ভালো লাগবে। বিষ্ণুপুর হলো বাংলার একটি ঐতিহ্যময় শহর। পাল রাজাদের আমলে পোড়ামাটির তৈরি টেরাকোটা, বিভিন্ন মন্দির এখানকার দর্শনীয়। রাসমঞ্চ, মদনমোহন মন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির ঘুরে দেখার মতো। এছাড়াও বাঁকুড়ার অন্য দর্শনীয় স্থানগুলি হলো শুশুনিয়া পাহাড়, বিহারীনাথ পাহাড়, সারদা মায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটী।

## ভারতের পথে পথে

# কুরুক্ষেত্র

মহাভারতে পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। চলেছিল আঠারো দিন ধরে। যে স্থানে যুদ্ধ হয়েছিল সেটি কুরুক্ষেত্র প্রান্তর নামে পরিচিত। এটি ছিল একটি ধর্মযুদ্ধ। কৌরবরা অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করেছিল। তখন পঞ্চপাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে কৌরবদের পরাজিত করে পাণ্ডবরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। এই যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে ছিলেন।

এই রণাঙ্গণেই অর্জুনকে গীতা উপদেশ দিয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যা যুগে যুগে মানুষকে পথ দেখিয়ে আসছে। কুরুক্ষেত্র বর্তমানে হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত।

## এসো সংস্কৃত শিখি

**बहुदिनेभ्य: ते परिचिता:।**

তারা বহুদিনের পরিচিত।

**तस्य कियत् धैर्य परयतु।**

তার ধৈর্যটা তো দেখুন।

**भवान् न उक्तवान् एव।**

আপনি তো বলেনই নি।

**अहं किं करोमि।**

এখন আমি কি করি।

**अहं न जानामि।**

আমি জানি না।

## ভালো কথা

# ব্যাঙ্কের লাইনে জল মিষ্টি

টাকা বদলের হিড়িকে ব্যাঙ্কের সামনে লম্বা লাইন। কেউ ভোর থেকে কেউ দু' থেকে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে। এই অবস্থায় আমরা ব্যাঙ্কে জল মিষ্টি বিতরণ করলাম। আমি দাদাদের সঙ্গে ছিলাম। একটা করে ছোট্ট জলের বোতল আর একটা মিষ্টি। আগের দিন থেকেই প্রস্তুতি ছিল। ব্যাঙ্ক খুলতেই আমরা সেখানে উপস্থিত হয়েছি। লাইনে দাঁড়ানো মানুষরা জল পেয়ে খুব খুশি। কারণ লাইন ছেড়ে কেউ বেরোতে পারছিল না। টাকা বদলের সিদ্ধান্তে আমরা একটা সমাজ সেবার সুযোগ পেলাম। বাইরে একটা এরকম আনন্দের ব্যাপার হওয়াতে ব্যাঙ্কের কর্মীরাও আরামে কাজ করতে পেরেছেন।

**সুস্নাত কর্মকার, অষ্টম শ্রেণী, কলকাতা।**

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## শব্দের খেলা

***লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে***

(১) য়া ন য় ক্রি

(২) বা তি ন হা

***সঠিক ভাবে সাজাতে হবে***

(১) বি য়া ক ল

(২) র ল ক তা

**২৮ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর**

(১) পাখিরালয় (২) রাজমহল

**২৮ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর**

(১) শৃঙ্খলাবদ্ধ (২) পার্থসারথি

**উত্তরদাতার নাম**

(১) শঙ্খশুভ্র দাস, বামুনিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর (২) রূপসা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা (৩) শুভম দাস, শিবপুর, হাওড়া (৪) শ্রেয়া চক্রবর্তী, রামপুর, বাঁকুড়া

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**


নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com


*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

অঙ্গনা

# চীনা দ্রব্য বর্জনে মহিলাদের ভূমিকা

**সুতপা বসাক ভড়**

গত কয়েক বছর ধরে দেশের প্রায় সব বাজার-হাটে চোখে পড়ছে মাটি, কাপড়, কাঠ, ধাতুর বদলে প্লাস্টিক, পলিথিন, প্লাস্টার অফ্ প্যারিস ইত্যাদি কৃত্রিম পদার্থের তৈরি জিনিসে বাজার ছেয়ে গেছে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে জিনিসগুলি চীনের তৈরি। ফুটপাথের ছোট্ট দোকান থেকে শুরু করে বড় বড় মলে ঢেলে বিক্রি হচ্ছে এসব জিনিস।

সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায়, চীন নিজের দেশের অর্থব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে তাদের তৈরি জিনিস আমাদের দেশে পাঠিয়ে লাভ করছে, আর সেই লাভের টাকায় আমাদেরই ক্ষতি করে চলেছে। সমসাময়িক ঘটনাবলীর দিকে দৃক্‌পাত করলে দেখা যাবে যে, বারবার সীমা লঙ্ঘন করা; ভারতের জমি দখল করে নিজেদের বলে ঘোষণা করা; ভারত মহাসাগরে অনাবশ্যক দখলদারির চেষ্টা করা; রামসেতু নষ্ট করার উস্কানি দেওয়া, তিব্বত অধিকার করে ভারতের ওপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করা; এছাড়া পাকিস্তানের মতো সন্ত্রাসবাদী দেশকে প্রশ্রয় দেওয়া বা সহযোগিতা করা ইত্যাদি চীন নিরলস ভাবে করে চলেছে।

ভারত ও চীন দুটিই জনবহুল দেশ। আবার প্রতিবেশী রাষ্ট্রও বটে। অথচ চীনের চিন্তাভাবনা আদৌ ভারত-হিতৈষী নয়। তারা তাদের দেশের বিরাট সংখ্যক শ্রমিক দিয়ে সস্তায় নিম্নমানের জিনিস তৈরি করে, কম দামে ক্রেতাদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। আমাদের দেশে গরিবের সংখ্যা বেশি। সেক্ষেত্রে বাজারে সস্তায় সহজলভ্য চটকদার চীনা সামগ্রীর উপভোক্তা অনেকেই, অথচ ওই জিনিসগুলির গুণবত্তা খুবই খারাপ, তা কিছুদিন ব্যবহার করলেই বোঝা যায়।

আসলে চীন খুবই চালাকির সঙ্গে ব্যবসা করছে। তারা তাদের দেশে নিম্নমানের কাঁচামাল আর শ্রমিক দিয়ে প্রচুর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস বানাচ্ছে, আর কম দামে ভারতের বাজারে বিক্রি করছে। সুতরাং সস্তায় পাচ্ছি বলে আমরা অনেকেই সেগুলি কিনে ফেলি। আমাদের দেশের জনসংখ্যা বেশি, সেজন্য চীনা জিনিসের বিক্রিও বেশি। এভাবে জেনে বা না জেনে আমরা কমদামে খারাপ জিনিস কিনে চলেছি। খারাপ হলে ফেলে দিচ্ছি। কারণ ওই জিনিসগুলি সারানো যায় না। মাঝখান থেকে আমাদের অর্থে চীনে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

বাড়িতে সাধারণত মহিলারাই বাজারের ব্যাপারটা দেখে থাকেন। সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে, নবজাত শিশুর বিছানা থেকে শুরু করে তোয়ালে, সাবান, পোশাক, ডায়াপার ইত্যাদিতে চীনা সামগ্রী ব্যাপকহারে ঢুকে পড়েছে। আর বাচ্চাদের পুতুল, খেলনা, পড়াশুনার সরঞ্জাম— পেন, পেন্সিল, রবার, পেন্সিল কাটার কল, স্টিকার, আঠা, রঙ পেন্সিল, ক্রেয়ন, জলরং, বই, খাতা; মেয়েদের ক্লিপ, হেয়ার ব্যান্ড, চুড়ি, ব্যবহার্য কাপ-প্লেট, ট্রে, গ্লাস; সস্তায় রান্নাঘরের সামগ্রী—গ্রাইন্ডার, মিক্সার, ব্লেন্ডার, জুমার, ফ্লাস্ক, জলের বোতল, হিটার, কুলার; এছাড়া জামা-কাপড়, জুতো-চপ্পল, মোজা রুমাল, কম্বল, শীতের পোশাক, টর্চ, বাল্ব, ইস্ত্রিরি, মোবাইল, টুথ ব্রাশ, চাবির রিং ইত্যাদি আরও অনেক জিনিস, এমনকী আমাদের ঠাকুরের মূর্তিও চীন থেকে তৈরি হয়ে আসছে।

কয়েকদিন আগে চীনের তৈরি মোবাইল বিস্ফোরণে একটি শিশুর হাত উড়ে গেছে। চাইনিজ মোবাইল বিস্ফোরণে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। কয়েকদিন আগে আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগ চীনের তৈরি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলগুলি যে ভারতে গোয়েন্দাগিরির কাছে ব্যবহৃত হচ্ছে তা প্রমাণ করেছে। চীন একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তারা আমাদের দেশে ব্যবসা এবং গোয়েন্দাগিরি দুটোই করছে, আর আমরা জেনেশুনে তাদের এই কুঅভিসন্ধিতে পা দিচ্ছি। জিনিস খারাপ হলে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চীনা জিনিসের বিল দেওয়া হয় না।

মহিলারা যদি একটু সজাগ হোন এবং প্রয়োজন অনুসারে কেনাকাটাকে প্রাথমিকতা দেন, তাহলে দেশ সমৃদ্ধ হবে। আমাদের দেশেই সব প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি হয়। সেগুলি চীনের থেকে উচ্চমানের, খারাপ হলে সারিয়ে নেওয়া যায়। সেজন্য সামান্য বেশি খরচ করে বিল-সহ তা কেনা প্রয়োজন। তাতে দেশের টাকা দেশেই থাকবে। চীনা জিনিস চেনা সহজ। তাতে লেখা থাকে 'মেড ইন চায়না' অনেক সময় চীনা লিপিতেও লেখা থাকে।

নিজের এবং দেশের কল্যাণার্থে চীনের মতো শত্রু মনোভাবাপন্ন দেশের তৈরি জিনিস ব্যবহার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তারা আমাদের দেশে ব্যবসা করে অর্থনৈতিকভাবে লাভান্বিত হয়, তারপর সেই অর্থে আমাদেরই ক্ষতিসাধন করে। সুতরাং আর নয়, আমাদের সজাগ হতে হবে। আমাদের টাকা-পয়সায় আমাদেরই ক্ষতি করতে দেব না। স্বদেশি জিনিস ব্যবহার করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহযোগী হবো। এ ব্যাপারে মহিলাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি পরিবারের মহিলারা যদি সজাগ হোন, তবে দেশের বাড়িতে বাড়িতে চীনা জিনিস ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে সমাজ এবং দেশ থেকে বর্জিত হবে চীনাসামগ্রী। ভারতে মতো একটি বড় বাজার হাতছাড়া হলে চীন অর্থনৈতিকভাবে অনেকটাই দুর্বল হবে, আর ততটাই মজবুত হবে আমাদের দেশের অর্থব্যবস্থা। দেশের ও দশের মঙ্গলার্থে মেয়েদেরই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। ■

**অতিথি কলম**

স্বামীনাথন আইয়ার

# কালোটাকাকে গরিব জনতার টাকায় পরিণত করার সুযোগ প্রধানমন্ত্রীর নাগালে

*ডিমনিটাইজেশন বা নোট বাতিল সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর কেটে গিয়েছে প্রায় এক মাস। এই সময়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই কিছুটা শ্লথতা প্রকটিত হয়ে উঠেছে। যে দেশের প্রায় সমগ্র অসংগঠিত ক্ষেত্রের অর্থনীতি নগদ নির্ভর সে ক্ষেত্রে মুদির দোকান থেকে মাসিক কাগজ পড়ার খরচ (যা অনায়াসেই চেকে মেটানো যায়) এমন বহুবিধ দেনা পাওনা কেবলমাত্র নগদ টাকায় করার ফলে নিশ্চিতভাবেই ধাক্কা লেগেছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়।*

*এখানে মনে রাখার দরকার, সরকারি ঘোষণার সময় যে প্রায় ১৫ লক্ষ কোটি টাকা অর্থনীতিতে আবর্তিত হোত, তার পুরোটাই কিন্তু জমা পড়া টাকার সমপরিমাণ নোট ছাপিয়ে অর্থনীতিতে ফিরে আসবে না। কালোটাকা বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে এর নবজন্ম আটকাতে প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবহারেও গুণগত পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর। তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্য নগদহীন মুদ্রাব্যবস্থা, কেননা একেবারে প্রাথমিক স্তরে কালোটাকা কিন্তু সৃষ্টি হয় নগদ লেনদেনের মাধ্যমে, তা সম্পত্তি, জমি, সোনা পাচার, বড় মুদির দোকান যাই বলা যাক না কেন। সদা ব্যস্ত দৈনন্দিন প্রয়োজনের দোকান থেকে মাসকাবারি কেনার পর চেকে দাম মেটানোর সময় কিন্তু এসে গেছে। এসে গেছে ডাক্তারবাবু, উকিলবাবুদের ফি দেওয়ার পর তাদের কাছ থেকে রসিদ নেওয়ার সময়ও। এতে সরকারের ঘরে যথাযথ কর আদায় হওয়ার অন্তত সুযোগ থাকবে। দেশব্যাপী কালোটাকা উদ্ধারের সময়সীমা রয়েছে ৩১ ডিসেম্বর অবধি। সেই ডেটলাইন পার হলে সরকারের তহবিলে কতটাকা উদ্ধার হতে পারে আর ব্যাঙ্ক বা এটিএমগুলিতে দ্রুত টাকার জোগান কীভাবে বাড়ানো যায় এ দুটি বিষয়ই সদা আলোচিত। অন্যদিকে, সবটাকা উদ্ধার না হলে সরকার যে কতটা সুবিধেজনক অবস্থায় থাকতে পারবে এই নিয়েই একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ রয়েছে এই লেখাটিতে।*

*—সম্পাদক।*

তিন সপ্তাহ ধরে নোটবন্দি প্রক্রিয়াটিকে তিন পর্বে ভাগ করে নিতে পারলে নানা ধরনের তথ্য ও সেই সুবাদে সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের কাজটাও কিছুটা সুবিধের হতে পারে।

৮ নভেম্বরের পর প্রথমপর্বে দেশের মানুষ সর্বাত্মকভাবে প্রধানমন্ত্রীর পেছনে দাঁড়িয়েছে— সবরকম অসুবিধে সাময়িক ভেবে নিয়েই।

দ্বিতীয় পর্বে অর্থনীতির বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ওপর লক্ষণীয় প্রভাব পড়েছে। এই নেতিবাচক প্রভাব অর্থে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষতি। অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী আগামী কয়েকটি ত্রৈমাসিক হিসেব নিকেশে যা খারাপ প্রভাব ফেলবে। এর ফলে দেশের জিডিপি ক্ষেত্রে দেড় লক্ষ কোটি টাকা সংকোচন হোতে পারে যা হয়তো ছোটখাটো মন্দা পরিস্থিতিরই সমতুল্য। এর প্রভাব আসন্ন উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে ভোটদাতাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের মধ্যে দেখা যেতে পারে।

কিন্তু মস্ত বড় ইতিবাচক সম্ভাবনাটি রয়েছে তিন পর্বের নাটকের শেষ পর্বে। ডিসেম্বরে সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নোটবন্দি থেকে সংগৃহীত টাকার যে অংশ সরকারের ঘরে ফিরবে না সেই টাকার বড় অংশ তিনি ২৫ কোটি জনধন খাতায় (যা তিনি ক্ষমতায় এসে খুলিয়েছিলেন) গচ্ছিত করবার অত্যন্ত সদর্থক ব্যবস্থা নিতে পারেন। আর এই ঘোষণা সম্ভবত উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার আগে বা চলতি নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেই ঘটতে পারে। আর উত্তর প্রদেশ নির্বাচনে তা যে বিজেপিকে বিপুলভাবে সাহায্য করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

উল্লেখিত প্রথম পর্ব ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। লোকসভা বিধানসভা মিলিয়ে মোট চোদ্দটি (দেশের বিভিন্ন রাজ্যে) নির্বাচন ও সঙ্গে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের স্থানীয় পৌর ও প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনগুলিতেও বিজেপি পর্যাপ্ত সাফল্য পেয়েছে। নোটবন্দি প্রক্রিয়ায় মানুষ যে তাঁর পাশে রয়েছেন তা বোঝার এগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিশেষ করে গুজরাটের ক্ষেত্রে তো দল নতুন নতুন ক্ষেত্রে জয় হাসিল করেছে। এটি প্রথম পর্বে নিশ্চিতভাবেই মোদীর জয়।

সাধারণত লোকসভা বা বিধানসভা উভয়ক্ষেত্রেই উপনির্বাচনের ফলে শাসকদলকেই বিজয়ী হতে দেখা যায়। এবারে তাই হয়েছে। খুব বড় রকমের ছন্দপতন বা আকস্মিক কিছু ঘটেনি। কিন্তু গুজরাটের পৌর ও জেলাভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে বিজেপি কংগ্রেসের থেকে ৪০টি আসন ছিনিয়ে নিয়েছে (যেটা মোট আসনের হিসেবে বিরাট)। মোট ১২৬টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১০৯টি যাকে বলা যায় নিরঙ্কুশ জয়। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে প্যাটেলদের যে অংশ বরাবরই বিজেপির সমর্থক বলে ধরা হয় তার চাকরিক্ষেত্রে সংরক্ষণ নিয়ে যে বিপুল আন্দোলন চালিয়ে আসছিল তাতে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তারা হয়তো বিজেপি বিরোধী হয়ে যেতে পারে। মহারাষ্ট্রের ১৪৭টি নগর পালিকায় ৫১টি আসন পেয়ে বিজেপিই এক নম্বর দল। অন্যদিকে পৌর কাউন্সিল ও পঞ্চায়েতগুলিতেও সর্বাধিক আসনও বিজেপি'র ঝুলিতে। তবে বিপক্ষে ধস নামানো জয় নয়।

এ থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, নোটবন্দির ফলে প্রধানমন্ত্রী হয়তো বিধ্বংসী কোনো জয় পাননি। কিন্তু পক্ষান্তরে তাঁর বিরোধিতায় তেমন কোনো ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ তো হয়নি উল্টে তিনি যথেষ্ট নির্বাচনী সাফল্যই পেয়েছেন। একই সঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভোটদাতারা কিন্তু কোনোভাবেই সংবাদমাধ্যমের বিপুলভাবে প্রচারিত নোটবন্দির আঘাতে মানুষের জনজীবন বিপন্ন বা তারা সমূহ বিপদের দোরগোড়ায়, দলে দলে অসংখ্য লোক ব্যাঙ্কের লাইনে মারা যাচ্ছে— এমন সব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে আদৌ বিচলিত হননি।

এই প্রথম পর্ব মেটার পর শুরু হলো দ্বিতীয় অঙ্ক। সংবাদমাধ্যমগুলিতে দেখা ও পড়া যেতে লাগল গরিবদের জনধন খাতাগুলিকে নিজেদের কালোটাকার আস্তানা বানাতে মজুতদারদের লেগে পড়া। সঙ্গে যোগ হলো টাকার বিনিময়ে গরিব লোক ভাড়া করে ব্যাঙ্কের লাইনগুলিকে বুথ জ্যাম করার কায়দায় কালোটাকা বদলে সাদা করার নিত্য খেলা। এর সঙ্গে খবরে আসতে লাগল শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলগুলিতে জীবনযাত্রা ও রুজিরোজগারের ওপর ধাক্কার খবর। ছোট ছোট অর্থনৈতিক সংস্থা যারা গ্রামাঞ্চলে একটা বড় অংশের মানুষের মধ্যে ঋণ দিত তাদের খাতায় আদায় ভয়ঙ্কর কমে যেতে থাকার কথাও সংবাদে উঠে এল। একটা অর্থনৈতিক ডামাডোলের পরিস্থিতি।

এই বিষয়ে অন্যান্য বিশ্লেষকের মত আমিও জানিয়েছিলাম যে আদতে মোট কালোটাকার একটা ক্ষুদ্র অংশই নগদে জমা রয়েছে, বেশিরভাগটাই বাড়ি, গাড়ি, সোনা বা বিদেশে চালান হয়েছে। তাই আমি বলেছি কালোটাকার তৈরি আটকাতে গেলে নোটবন্দির সঙ্গে আরও আনুষঙ্গিক আইনি সংস্কার দরকার। হঠাৎ করে অর্থনীতির আবর্তন কিছুটা থমকে গেলে টাকার জোগান ব্যাপকভাবে কমে গেলে অর্থনীতিতে ছোট খাটো মন্দার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। জিডিপি-র ক্ষেত্রে ১ শতাংশ কম হওয়া মানে দেড় লক্ষ কোটি টাকা ঘাটতি।

এইরকমই একটা পরিস্থিতি কিছুটা সৃষ্টি হয়েছে। এর পরিণতিতে জনতার মন কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিরূপ হতে পারে। এটাও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের পর রাতারাতি যাদুমন্ত্রে সবকিছু একেবারে ঠিকঠাক হয়ে যাবে না। হয়তো সম্পূর্ণ শুভ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হলেও প্রধানমন্ত্রী যেমনটা ভেবেছিলেন যে অর্থনীতি তাড়াতাড়ি চলমান হয়ে উঠবে তা হয়তো ঘটবে না। মন্দার পরিস্থিতি কিছুটা প্রলম্বিত হবে বলেই মনে হয়। আর এর হাত নাগাদ ফল উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আসছে তৃতীয় বা অন্তিম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী এ যাবৎ বাতিল হওয়া ১০ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কে ফিরে এসেছে ৪ ডিসেম্বর। জনধন খাতায় ৬৪ হাজার কোটি টাকার ওপর জবরদস্তি কালোটাকার মালিকরা তাদের বেআইনি টাকাকে ঢুকিয়েছে। মোদী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এই খাতাগুলির ছানবিন হবে। এখান থেকে টাকা না তোলার অনুরোধও তিনি গরিবদের করেছেন। এখন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের সঙ্গে আমারও ধারণা ১৫ লক্ষ কোটি টাকার অপসারিত নোটের ১০ থেকে ২০ শতাংশ আর অর্থনীতিতে ফিরে আসবে না। এই অঙ্কটা দেড় বা তিন লক্ষের মাঝামাঝি কিছু একটা হতে পারে।

এইখানেই থেকে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রশমনের একটা বড় সুযোগ। এখানে একটা সফল রাজনৈতিক চালের অবকাশ রয়েছে। ২৫ কোটি জনধন খাতায় যদি ১.৫০ লক্ষ কোটি না ফেরা টাকা বা ৩ কোটি না ফেরা টাকা প্রথমক্ষেত্রে ৫ হাজার, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে ১০ হাজার অনায়াসে জমা করে দেওয়া যেতে পারে। বিদেশ থেকে কালোটাকা তো রাতারাতি ফেরে না। কিন্তু আজ অবধি দেশের কোনো সরকার গরিব দেশবাসীর খাতায় কখনও এক টাকাও ফি জমা দিয়েছে? বিরোধীরা এ নিয়ে যতই ঘোঁট পাকাবার চেষ্টা করবে ততই তাদের বিপদ বাড়বে। গরিবের খাতায় 'টাকা জমা' হয়ে থাকবে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ— তা যতটুকুই হোক না কেন।

এই প্রচেষ্টার অর্থনৈতিক সুবিধেটা বলে শেষ করব। আগে যে মন্দার পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে প্রথমেই দরকার হবে জিনিসপত্রের চাহিদায় বৃদ্ধি ঘটানো। দেশের নাগরিকদের ২৫ কোটি ব্যাঙ্ক খাতায় লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা জমা করাতে পারলে (সব খাতা মিলিয়ে) অর্থনীতির চিরকালীন নিয়ম অনুযায়ী চাহিদা বাড়বেই। গরিব মানুষেরা টাকা হাতে পড়লেই খরচা করার চেষ্টা করে। তাই জনধন খাতার মাধ্যমে চাহিদায় বৃদ্ধি ঘটানো একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপই হবে। উৎপাদন ক্ষেত্রে নোটবন্দিজনিত ঘাটতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটলেই পুনরুত্থান ঘটবে বলে ধরা যায়।

এক্ষেত্রে কী সমস্যা হতে পারে? আর বি আই গভর্নর না বলবেন? সমস্ত বাতিল নোটই কি ব্যাঙ্ক ফিরে আসবে? কিছুই কি মজুতদারদের কালো কোষাগারে আতঙ্কে পড়ে থাকবে না? এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই জনধনই হয়ে উঠতে পারে অর্থনীতির চালিকাশক্তি আর সেটা বাজেটে ঘোষণা বা তার আগেও ঘটে যেতে পারে।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

# কাশ্মীর সমস্যার প্রেক্ষাপট বিশ্বকে জানানো জরুরি

ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

উরিতে সাম্প্রতিক জঙ্গি-হামলার পর এখন ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক একটা বিস্ফোরণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ওই দেশের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক স্তরেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত তৈরি করা হয়েছে, সেনাবাহিনীকেও সতর্ক রাখা হয়েছে।

এটা লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষকে ভেঙে এই দুটো দেশ তৈরি করা হলেও এই উপ-মহাদেশে শান্তি স্থাপিত হয়নি। ভারত প্রথম থেকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা 'political culture' আদৌ শান্তি, সৌহার্দ্য ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় দেয়নি। দেশটার আবির্ভাবের অল্প পরেই সেখানে সামরিক শাসকের প্রবর্তন তার মূল্যবোধকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। বারবার পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এক সময় পাক-নেতা ভুট্টো 'হাজার বছরের' যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে ওই দেশ অসংখ্যবার জঙ্গি পাঠিয়েও ভারতকে রক্তাক্ত করেছে। যখনই অভ্যন্তরীণ সমস্যা সেখানে প্রকট হয়েছে পাক-কর্তৃপক্ষ তখনই ভারত-বিরোধী কার্যকলাপের মাধ্যমে জনমতকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

বিশেষ করে, কাশ্মীর হয়ে উঠেছে দুই দেশের সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৪০ সালে যখন লীগ ভারত-ভাঙার স্বপ্ন দেখছিল, তখন তার পরিকল্পনায় কাশ্মীরও ছিল কাঙ্ক্ষিত অঞ্চল। কিন্তু তার সেই সোনালি স্বপ্ন সফল হয়নি বাস্তব কারণেই। কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভারতে যোগ দিয়েছেন বৈধ পদ্ধতিতেই এবং স্বেচ্ছায়। সেই থেকে পাকিস্তান কাশ্মীরকে নিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

এই ব্যাপারে সম্প্রতি ভারতে জনমত এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে যে, একটি যুদ্ধের আবাহাওয়া তৈরি হয়ে গিয়েছে। অনেকে মনে করেন, একটা প্রচণ্ড সামরিক আঘাত হেনে এই নির্লজ্জ প্রতিবেশীকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, সেই সময়টা এখনও আসেনি। বিশেষ করে যখন পাকিস্তানও পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। এই কারণেও এখন যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। তবে ইজরায়েলের মতো জঙ্গিদের ধাওয়া করে সীমান্ত-সংলগ্ন অঞ্চলে জঙ্গিঘাঁটিগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা— সেটা ভেবে দেখা দরকার। তাতেও অবশ্য একটা বড়সড় যুদ্ধের ঝুঁকি থেকে যায়— কিন্তু এই ব্যাপারে সমরবিশেষজ্ঞদের মত নেওয়া দরকার।

দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী মোদী ও বৈদেশিক মন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে আরও বেশি করে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচারে নামতে হবে। এখন অনেক দেশই পাকিস্তানকে জঙ্গি-দেশ বলে মেনে নিয়েছে। সেটা আরও বেশি করে প্রচারের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে ও আন্তর্জাতিক সংগঠনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করে তোলা দরকার। একটা যুদ্ধকে বোধ হয় বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। আমরা সেটা পরিহার করার চেষ্টা করব— কিন্তু আত্মরক্ষার প্রয়াসে যেন ত্রুটি না থাকে। আমাদের বোধ হয় এখন দরকার পারমাণবিক ছত্র ('atomic umbrella')।

**১৯৬৬ সালের যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী লাহোর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, আর ১৯৭১ সালে ভারত বন্দি করেছিল প্রায় এক লক্ষ পাক-সৈন্য। কিন্তু মৈত্রীর উদ্দেশে ভারত পাকিস্তানের জমি ফেরত দিয়েছে, মুক্তি দিয়েছে সেই বন্দি সেনাদেরও। কিন্তু তার কোনো মূল্য পাকিস্তান দেয়নি।**

চতুর্থত, সবচেয়ে জরুরি বিশ্ববাসীকে জানানো কাশ্মীর-সমস্যার প্রেক্ষাপটটা। সর্বাধিক বোঝাতে হবে— এই রাজ্যের ওপর পাকিস্তানের কোনো দাবিই নেই— এটা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

দেশভাগের সময় (১৯৪৭) ভারতের ৫৬২টা দেশীয় রাজ্য তা 'Princly states' ছিল। ব্রিটিশ সরকার দেশ ছাড়ার আগে জানিয়েছিল--- তাদের রাজা/নবাব 'ইন্সট্রুমেন্ট অফ স্যাক্সেশন'-এ স্বাক্ষর দিয়ে ভারত বা পাকিস্তান ডোমিনিয়ানে যোগ দিতে পারবে— অন্যথায় তারা স্বাধীনভাবে থাকবে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই তখন ভারতে যোগ দিয়েছে। কেউ কেউ হয়েছে পাকিস্তানের অংশ।

কাশ্মীরের রাজা হরি সিং অবশ্যই স্বাধীনভাবে থাকতে চেয়েছেন। ভারতের বড়লাট মাউন্টব্যাটেন ভারতের হয়ে তাঁর

সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি কৌশলে তাকে এড়িয়ে গেছেন--- (লিওনার্ড মস্‌লে— দ্য লাস্ট্‌ ডেজ অফ দ্য ব্রিটিশ রাজ, পৃ. ২১২)। কিন্তু ঘটনাচক্রই তাঁকে ভারতের দিকে টেনে এনেছিল।

হানাদারদের নিয়ে পাক্‌-বাহিনী হঠাৎ কাশ্মীরে ঢুকে পড়েছিল ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে। তারা দ্রুত রাজধানী শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে চলেছিল। বিপদ বুঝে রাজা হরি সিং তাঁর প্রধানমন্ত্রী মেহেরচাঁদ মহাজনকে ভারতে পাঠিয়েছেন সামরিক সাহায্যের জন্য। কিন্তু ভারত-সরকার জানিয়েছিল যে, রাজা পূর্বোক্ত দলিলে স্বাক্ষর না দিলে ভারতের পক্ষে পদক্ষেপ করা আইনত উচিত হবে না— (ড. বিদ্যাধর মহাজন— দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ২৪২)। অতঃপর মহাজন কাশ্মীর ফিরে গিয়ে রাজার স্বাক্ষর নিয়ে এসেছেন। এভাবেই কিন্তু কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। ভি. এন. খান্না লিখেছেন, 'It is only affect the commencement of aggrassion that of nervous Hari Singh Signed the Instrument of Accession in favour of India'— (ফরেন পলিসি অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৯)।

সুতরাং বলা যায়--- কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তি একটা বৈধ ও ন্যায্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের কোনো দাবিই থাকতে পারে না। কে. বি. কেশওয়ালী এই কারণে মন্তব্য করেছেন, 'No third party has this right to question it'— (ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান, পৃ. ৩০৯)। মনে রাখতে হবে, রাজা সেই দলিলে স্বাক্ষর দিয়ে একটা চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। তাতে ছিল— 'I have no option but to ask for the help from the Indian Dominion'— (উদ্ধৃত স্বদেশ সিং--- কাশ্মীর, প. ৮৭)। সংবিধান-বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসুর মতে, যে দলিলে স্বাক্ষর দিয়ে অন্যান্য দেশীয় রাজ্য ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিয়েছে, সেটাতেই হরি সিং স্বাক্ষর দিয়েছেন। তাহলে তার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দাবি ওঠে কেমন করে--- (ইন্ট্রোডাক্‌শান টু দ্য কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ২২৯)। এই ইতিহাসটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে হবে।

পঞ্চমত, আমাদের গোয়েন্দা-দপ্তরকে আরও অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে। কার্গিলের সময় বান্‌জারারা এবং তাজ-আক্রমণের আগে সি. আই. এ. আমাদের আগাম সতর্কবার্তা দিয়েছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সাবধান হননি। এটা কিন্তু চলতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বলি— কেউ কেউ আফজল গুরু, কাসভ প্রমুখকে 'শহিদ' সাজাচ্ছে, কাশ্মীর-অরুণাচলের মুক্তি চাইছে। এই দেশদ্রোহিতা ক্ষমার অযোগ্য। এর মোকাবিলা করতেই হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুবাদে এরা নিজেদের মনে করে সবজান্তা। সুতরাং শত্রু-দেশের জঙ্গি-ঘাতকদেরও শহিদ বানানো যায়। তাদের পেছনে কিছু স্বল্প-শিক্ষিত 'আঁতেল'—তাঁরা মনে করে এই বাক্‌- স্বাধীনতা মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এটা বলা দরকার যে, তারা সংবিধান-সংক্রান্ত কোনো বইয়ের মলাটও দেখেনি। আমাদের সংবিধানের ১৯ (১) (৩) নং অনুচ্ছেদ অবশ্যই মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট করেছে তার সীমা। ১৯ (২) নং অনুচ্ছেদে সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন ভারতের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, মিত্র-রাষ্ট্রের সঙ্গে সখ্য, শান্তি-শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, আদালতের মর্যাদা, অন্যের সম্মান ইত্যাদি রক্ষা করেই এই অধিকার ভোগ করতে হবে। অবশ্য প্রথম দিকে এই ব্যাপারে এত বাধা-নিষেধ ছিল না (ড. হরিহর দাস--- ইন্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ১২০)। কিন্তু দুটো সংবিধান-সংশোধন এই অধিকারকে বেশ সীমিত করে দিয়েছে। বিশেষ করে ষোড়শ সংবিধান-সংশোধন (১৯৬৩) ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ ও মত প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছে (ড. এস. সি. কাশ্যপ--- আওয়ার কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ১০৯)। সুতরাং সরকারকে এই ধরনের দেশবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে নির্মমভাবেই। এই পঞ্চমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতি কঠোরভাবে তৈরি করা দরকার।

পাকিস্তান তার জন্মমুহূর্ত থেকেই ভারত-বিরোধিতা করে চলেছে। কিন্তু ভারত চেয়েছে সমঝোতা, মৈত্রী ও সহযোগিতা। বলা হয়েছে— 'Peaceful and political setlement of international disputes represents other objective of India's foraign policy' (ড. শক্তি মুখার্জী— ইন্দ্রাণী মুখার্জী— ইন্টারন্যাশনাল রিলেসান্স, পৃ. ২৭৮)। কিন্তু পাকিস্তান তিনবার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ১৯৬২ সালে তার মিত্র-রাষ্ট্র চীন ভারতকে আক্রমণ করলে পাকিস্তান চীনকেই সমর্থন করেছে। আবার ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান-যুদ্ধে চীন সমর্থন জানিয়েছে পাকিস্তানকে।

আজও এভাবেই পাকিস্তান তার আজন্ম বৈরিতা অব্যাহত রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ভারতীয় বাহিনী লাহোর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, আর ১৯৭১ সালে ভারত বন্দি করেছিল প্রায় এক লক্ষ পাক-সৈন্য। কিন্তু মৈত্রীর উদ্দেশে ভারত পাকিস্তানের জমি ফেরত দিয়েছে, মুক্তি দিয়েছে সেই বন্দি সেনাদেরও। বারবার দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ও আধিকারিকদের বৈঠক হয়েছে। কিন্তু তার কোনো মূল্য পাকিস্তান দেয়নি। ১৯৬৫ সালে রাশিয়ার উদ্যোগে তাসখন্দ-চুক্তিও হয়েছিল। কিন্তু ভি. এন. খান্না মন্তব্য করেছেন, তার কোনো মর্যাদা রক্ষিত হয়নি পাক্‌-অসহিষ্ণুতার কারণে--- 'The promice was aborted. The issues were too introctable, the standpionts too opposite, the gulf of suspicion, joalousy and rivalry too wide'— (ইন্ডিয়া বা ফরেন পলিটিক্স পৃ. ১৯৩)। সেই দেশ সব সময় ও সব ক্ষেত্রে ভারত-বিরোধিতা করেছে। ভারত প্রথম থেকেই জোট-নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে, কিন্তু পাকিস্তান যোগ দিয়েছে মার্কিন জোটে। আর ভারত রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করায় পাকিস্তান বেছে নিয়েছে চীনকে— (সি. ডি. এম. কেটেলবী--- এ হিস্ট্রি অফ মডার্ন টাইমস্‌, পৃ. ৬০৩)। সুতরাং সমঝোতার সম্ভাবনা নেই। আমরা অবশ্যই যুদ্ধ চাই না— কিন্তু প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষার বিকল্প নেই।

*(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)*

# নোট বাতিল : শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্নপূরণ

**বরুণ মণ্ডল**॥ প্রধানমন্ত্রীর 'সার্জিকাল স্ট্রাইক অন ব্লাকমানি' ঘোষিত হলো ৮ নভেম্বর। তোলপাড় দেশ বিদেশ। মোদীর কথায় গরিব হাসছে, আমির কাঁদছে। যুক্তি আর সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বেশির ভাগই 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'র প্রতিবাদ। ১৯৪৭ সালের পর থেকে জনতার কথা কেউ ভাবেনি। ভেবেছে ভোটবক্সের কথা। নোট বদল বা ডিমানিটাইজেশনের সম্ভাব্য সুফল।

**নিয়ন্ত্রিত হবে বাজারহাট :** নোটবদলের ফলে ভারতের বাজারে আইনের শাসন আসবে। কালোটাকার রমরমাতে একদল মানুষের কাছে প্রচুর নগদ টাকা হয়েছে। বাজারে গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষেরা ঢুকতেই পারছিল না। ভালো মাছটার দিকে তাকানোর আগেই ফস্ করে হাজার টাকার নোট বেরিয়ে পড়ছিল। ভাগ্যের উপর দোষ দিয়ে ভোলামাছেই সীমা রেখা টেনেছিল মেছো বাঙালি। এবার আর হবে না। বাজারে এবার সাম্য আসতে চলেছে।

**কাশ্মীরে ঢিল ছোঁড়া বন্ধ :** কথায় কথায় স্বর্গরাজ্য কাশ্মীর অশান্ত ও নরক রাজ্যে পরিণত হচ্ছিল। পাথর পিছু যদি ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট মেলে, তবে দুটো পাথর ছুঁড়লে কী হয়! নগদ নারায়ণ পেলেই হলো। পাথর ছোঁড়ার পৃষ্ঠপোষকদের হাজার, পাঁচশ টাকার বান্ডিল কাগজ হওয়া মাত্র দেশীয় জঙ্গির কবল থেকে দেশ রেহাই পেয়েছে।

**শয়তানের নটে গাছটি মুড়ালো :** সমাজ চলছিল শয়তানের অঙ্গুলি হেলনে। টাকা যার, দেশ তার। আইন তার। সভ্য ও সৎ মানুষের গায়ে থুতু ছেটায় মূর্খ বিত্তবানদের সমাজ। সত্যি হয়তো সমাজতন্ত্র আনবে এই 'ডিমানিটাইজেশন' নীতি। অযোগ্য ব্যক্তিরা বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের পরিচালন পরিষদে ঢুকে পড়েছে। অবশ্যই তা কালোধনের কল্যাণে। বর্তমানে সমাজে সম্মানের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে উঠেছে টাকা। সঠিকভাবে যদি নোটবদলের নীতি প্রয়োগ করা যায়, তবে সংবিধান ঘোষিত 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দের অর্থ

বহন করবে আমাদের দেশ।

**জঙ্গি জমানার রক্তহীনতা :** নোটবদল নীতির ফলে স্বাধীন ভারতকে অস্থির করে তোলা বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন আর্থিক রক্তহীনতায় ভুগছে। যেমন গত ২২ নভেম্বর অর্থের অভাবে ওড়িশার মালকানগিরিতে ২২২ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে।

**ঘুষহীন প্রশাসন, যোগ্যতমের উর্ধ্বতন :** কালক্রমে ঘুষই আইন হয়ে উঠেছে। তাই, উচ্চ বেতন পাওয়া সত্ত্বেও নির্লজ্জের মতো হাতপাতা স্বভাব এক শ্রেণীর ভারতবাসীর। চাকরি পেতে আজ পড়াশোনা করতেহয় না; লাগে ঘুষ। যোগ্যই হও আর অযোগ্যই হও, ঘুষ দেওয়াটাই দস্তুর। এভাবেই সমাজে যে বিরাট দালালচক্র, তাদের অবৈধ টাকার পাহাড়। ডিমানিটাইজেশনের ফলে ঘুষ নেওয়াটা বড়ই মাথাব্যথার কারণ হয়ে পড়েছে। আশা করা যায়, কর্মক্ষেত্রে এবার যোগ্যতা দেখিয়ে যোগ্যরা জায়গা পাবে।

**দালাল চক্রের মাথায় হাত :** জন্ম থেকে বিয়ে বা হাসপাতাল থেকে শ্মশানঘাট— সর্বত্র দালাল ও অবৈধ লেনদেনের কারবার। ফুলে ফেঁপে উঠেছে দিনে দিনে। জমি-বাড়ি কেনা বা বেচার ক্ষেত্রে ১ টাকার মাল ১০ টাকায় বিকোতে হাজির দালালরাজ। কিন্তু আজ কোথায় রাখবেন সেই সব প্রতারণার কালোটাকা? পুরানো টাকার চিন্তায় মাথা খারাপ, আবার নতুন করে দালালির হিসাবহীন টাকা? বন্ধ থাকুক দালালি কারবার!

**চিটফান্ড চিৎপাত :** চিটফান্ড রোধের আইন আছে প্রচুর। কিন্তু দেখভাল করার আধিকারিক নেই। যাঁরা আছেন তাঁরা আবার টাকার মোহে 'দিনকে রাত' করতে ওস্তাদ। হিসাব দেখানোর বালাই নেই। ফাঁকি দেওয়ানোর জন্য বড় বড় চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছে। সরকারি অনুদানে কত বড় অফিসার তৈরি হচ্ছে সরকারকে দেউলিয়া করার জন্য। তারাই বলে দেবেন কীভাবে সরকারি কর ফাঁকি দিয়ে আপনি হবেন কোটিপতি। কিন্তু মোদীজী এমন দাওয়াই দিয়েছেন যে গোগ্রাসে গেলা টাকার বান্ডিল বদহজম হয়ে গেছে।

**ফিদেল কাস্ত্রোর স্বপ্ন পূরণ?** বিশ্বজুড়ে বামপন্থীরা বক্তৃতা করেছেন, আন্দোলন করেছেন কিন্তু তাঁদের মতাদর্শের বাস্তব প্রয়োগ হলো কই? সমাজতান্ত্রিক চীনেও অসাম্য প্রচুর। সেখানেও ধনের অসাম্য থেকে গেছে। আর আমাদের দেশে বাম নেতারা এসি গাড়ি বাড়িতে মৌজ করছেন। গরিবের পার্টি তহবিলে ৪০০ কোটি জমা হয়েছে নাকি! সমাজতান্ত্রিক নেতারা কখন যে ধনতন্ত্রের পূজারি হয়ে পড়েছেন নিজেরাই বুঝতে পারেননি। মোদীর নোট বাতিল সিদ্ধান্তে দু'চোখে দেখার সময় না পাওয়া 'বড়লোক' ছেলে মেয়েরা বুড়ো বাপ মায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢালছে। মালিকেরা আজ অছুত ঝি/চাকরদের জন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ঢালছেন। কার্লমার্কস, কাস্ত্রোরা তো এমনই চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রের টাকার সমবণ্টন। কাস্ত্রোর আত্মা কি ডানপন্থী নরেন্দ্রর জন্যই অপেক্ষা করছিল!

**চোরের উপর বাটপাড়ি!** অনেক অনুরোধ আদেশ সত্ত্বেও বিশাল সংখ্যক ভারতবাসী মোদীজীর ভারত গড়ার ডাকে সাড়া দেয়নি। ভারত চুলোয় যাক, কিন্তু তাঁরা থাকবেন কালোটাকার পাহাড়ে! ভারত বিদ্বেষী অমানুষদের সাহায্যে বিদেশি শত্রুরা জালটাকার নোটে ছেয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষকে। ভারতের অর্থনীতি ধ্বংস করার এই ছক বানচাল হয়েছে নোটবদল নীতির ফলে। সোজা আঙুলে ঘি উঠছে না দেখেই মোদীর এই 'বাঁকা আঙুল' নীতির প্রয়োগ। মোদীর অনুরোধকে দুর্বলতা ভেবেছে এবং আদেশকে কাঁচকলা দেখিয়েছে শয়তানরা। তাই 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে'। ■

# জাতীয় সঙ্গীত আর বাথরুম সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য কী সুপ্রিম কোর্ট বুঝিয়ে দিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** খবরটা এল তাজা একঝলক হাওয়ার মতো। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, এখন থেকে প্রত্যেকটি সিনেমা হলে সিনেমা শুরু হওয়ার আগে জাতীয় পতাকার ছবি-সহ জাতীয় সঙ্গীত বাধ্যতামূলক ভাবে বাজাতে হবে এবং সেই সময় প্রতিটি দর্শককে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের আর একটি নির্দেশ : জাতীয় সঙ্গীতকে কোনোভাবেই বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে না। বিচারপতি দীপক মিশ্র এবং অমিতাভ রায়ের যৌথ বেঞ্চের রায়ে বলা হয়েছে, 'এটা এমন একটা সময় যখন দেশের প্রতিটি মানুষকে বুঝতে হবে তারা এক অভিন্ন জাতীয়তার নিগড়ে বাঁধা। জাতীয় সঙ্গীত আমাদের সাংবিধানিক দেশাত্মবোধের প্রতীক। সুতরাং জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমাদের সকলের দায়বদ্ধতা। ধর্ম, সংস্কৃতি, ব্যক্তিস্বাধীনতা বা অন্য কোনো কারণে জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা করা যায় না।'

সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। মহামান্য আদালত দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখতে চায়। এই চাওয়া কোনো ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সেখানকার মানুষ জাতীয় সঙ্গীত শুনে উঠে দাঁড়ান, গলা অথবা ঠোঁট মেলান। জাতীয় সঙ্গীত যে জাতীয়তাবোধের সোপান বিশেষ, শ্রদ্ধার পাত্র, সে কথা তাদের ঘাড় ধরে বুঝিয়ে দিতে হয় না। আমেরিকার মানুষ জাতীয় সঙ্গীত বাজার সময় জাতীয় পতাকার দিকে মুখ করে উঠে দাঁড়ান। অসামরিক নাগরিকেরা শুধু বুকে হাত রেখে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকেদের ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম। তারা উঠে দাঁড়াবেন এবং অভিবাদন করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ না জাতীয় সঙ্গীত শেষ হয়। ব্রিটিশ নাগরিকেরাও যখন যেখানে জাতীয় সঙ্গীত বাজে, উঠে দাঁড়ান। জাপানে সিনেমা হলে ছবির শেষে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। দর্শকেরা উঠে দাঁড়ান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এইসব দেশে জাতীয়

সঙ্গীতের প্রতি মানুষ কীভাবে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করবে তার কোনো আইন নেই। আইনসভা বা আদালতও কখনও নাক গলায় না। মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অথচ স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও ভারতে জাতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। এখানে ক্রিকেটসংস্থার শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে এসে বলিউডের মহাতারকা নায়ক বিনা দ্বিধায় ভুল সুরে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারেন। কেউ প্রশ্ন করলে বলে দিতে পারেন, প্র্যাকটিস করার সময় পাননি। তাই সুপ্রিম কোর্টকে ঘাড় ধরে বুঝিয়ে দিতে হয় জাতীয় সঙ্গীত ও বাথরুম সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্যটা কী!

যদিও এই বিষয়ে আদালত এই প্রথম কথা বলছে না। ৬০-৭০-এর দশকে সিনেমা শেষ হবার পর জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর চল ছিল। ১৯৭১ সালে সংসদ এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করেছিল। যাতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, জাতীয় সঙ্গীত বাজার সময় উঠে দাঁড়ানো বাধ্যতামূলক।

ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে সমর্থন করলেও কোনো কোনো মহল থেকে আপত্তি উঠেছে। তাদের কারও কারও বক্তব্য রীতিমতো হাস্যকর। রাজীব ধওয়ানের কথাই ধরা যাক। সংবিধান বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি সারা দেশে সুপরিচিত কিন্তু আদালতের নির্দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের মতাদর্শকে গুলিয়ে ফেলতে তাঁর বাধে না। অনায়াসে বলতে পারেন, 'এই নির্দেশ অনেকটা বিজেপির স্লোগানের মতো। এ দেশে অনেকেই বাস করেন যাঁরা অন্য ধর্মের মানুষ, জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন উঠে দাঁড়ানোতে তাঁদের ধর্মীয় অসুবিধে থাকতে পারে, কোনো ব্যাপারে তাঁদের ওপর জোর খাটানো আদালতের উচিত নয়!' কে.কে. বেনুগোপাল বলেন, 'জাতীয় সঙ্গীত শুনে কিছু লোক উঠে না দাঁড়ালে কী যায় আসে!' অর্থাৎ এখানেও সেই ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি! মুসলমানরা যা আমেরিকায় পারেন, ব্রিটেনে পারেন ভারতে পারেন না। জাতীয় সঙ্গীতের সময় উঠে দাঁড়ালে তাদের জাত যায়।

কেউ কেউ বিচারপতি দীপক মিশ্রের একটি পুরনো রায়ের প্রসঙ্গ তুলেছেন। যে রায়ে তিনি একদা দর্শক প্রশংসাধন্য ছবি 'কভি খুশি কভি গম'-এর প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ ছবিতে একটি বাচ্চা ছেলে জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম পাঁচ লাইন গেয়েছিল। পরের পাঁচ লাইন গেয়েছিল তার মা। আদালতের দৃষ্টিতে সেটা ছিল জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা। তাই এই নতুন নির্দেশের সমালোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বিচারপতির মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রমাণ করতে চেয়েছেন এই নির্দেশ অতীব রক্ষণশীল। কিন্তু কেউ ভুলেও প্রশ্ন করেননি কেন আমরা এতদিন জাতীয় সঙ্গীত শুনতে শুনতে পপকর্ন খেতাম? কাউকে ফোন করার ওটাই ছিল আদর্শ সময়। আমেরিকানরা এরকম করে না। ব্রিটিশেরাও করে না। শুধু আমরা ভারতীয়রা করি। এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার এক রসিক অসাধারণ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ভারতের স্বাধীনতা মাঝরাতে এসেছিল। তাই স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমাদের রাত এখনও ফুরলো না।' ■

অন্য রকম

গুড্ডু ও তাঁর ভাইয়েরা। সামনে ছেলে কোলে তাঁদের স্ত্রী রাজো।

# পাঁচ স্বামীর একজন স্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা থেকে ফেরার পর যুধিষ্ঠির নিতান্ত ঠাট্টা করেই বলেছিলেন, 'মা আমরা কী এনেছি দেখে যাও!' মহাভারত রচনাকারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কুন্তী ভেবেছিলেন ছেলেরা নির্ঘাত বড় কোনো জন্তুজানোয়ার শিকার করে এনেছে। কিংবা বনের ফলমূলও হতে পারে। বনবাসকালে খাদ্য, পানীয় এবং নিরাপত্তার অভাবই প্রধানতম চিন্তার কারণ। তাই কুটীরের ভেতর থেকেই জবাব দিয়েছিলেন, 'যা এনেছ সবাই মিলে ভাগ করে নাও।'

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এরকম একটি অমানবিক এবং সমাজে অপ্রচলিত সিদ্ধান্তে দ্রৌপদীর নারীত্ব লাঞ্ছিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে চল না থাকলেও অন্যান্য কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুভর্তৃকা প্রথার চল ছিল। বিশেষ করে যেসব সম্প্রদায়ে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম সেখানে মেয়েরা একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতেন। সাধারণভাবে স্বামীরা হতেন সহোদর ভাই। অর্থাৎ একই বাবা-মা-র সন্তান।

ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, সেই মহাভারতের যুগের প্রথা এখনও ভারতে রয়ে গেছে। পরিবারভিত্তিক ভারতীয় সমাজব্যবস্থার শিকড় কতদূর ছড়িয়ে পড়তে পারে বহুভর্তৃকা প্রথার টিকে থাকা তার প্রমাণ। বেশিদূর যেতে হবে না। দেহ্‌রাদুনের নিকটবর্তী ছনুয়া গ্রাম। এখানকার মেয়েরা এখনও একাধিক পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্যই সেই পুরুষেরা সকলে সহোদর হবেন। একই পরিবারভুক্ত এবং একসঙ্গে কোনো একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে বসবাস করেন।

ছানুয়া গ্রামে পা ফেলা মাত্র নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, এটাই কি ২০১৬-র ভারতবর্ষ? ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দাপাদাপির লেশমাত্র নেই। আশ্চর্য শান্ত পাহাড়ি গ্রাম। সদ্য সকাল হয়েছে। যে যার মতো সকলেই কাজে ব্যস্ত। আলাপ হলো রাজো ভার্মার সঙ্গে। ২১ বছর বয়স। বিয়ে হয়েছে একই পরিবারের পাঁচ ভাই-য়ের সঙ্গে। একেকদিন একেকজন স্বামীর সঙ্গে তার কাটে। একটি তিন বছরের ছেলে আছে রাজোর। জানেন না, কোন স্বামী তার বাবা! পাঁচজনেই ছেলেকে ভালোবাসে। অসুখ-বিসুখ করলে পাঁজজনেই পালা করে রাত জাগে। প্রকৃত বাবা জেনে ফেললে অন্যরা হয়তো নিজেদের বাবা ভাবতেই পারত না। তার চেয়ে এই ভালো। কিন্তু রাজো, আপনি কোন স্বামীকে ভালোবাসেন? প্রশ্ন শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েন রাজো, বলেন, 'পাঁচজনকেই!'

কথায় কথায় জানা গেল পরিবারের জ্যেষ্ঠ গুড্ডুর সঙ্গে রাজোর প্রথমে বিয়ে হয়েছিল। তারপর একে একে বইজু (৩২), সন্তরাম (২৮), গোপাল (২৬) এবং দীনেশের (১৯) সঙ্গে হয়। গুড্ডু বলেন, 'ও আমার প্রত্যেক ভাই-য়েরই স্ত্রী। কিন্তু তার জন্য আমার কখনও ঈর্ষা হয় না।' মনে হলো যেন মহাভারতের পাতা থেকে স্বয়ং অর্জুন উঠে এলেন। তিনিও প্রায় একই কথা বলেছিলেন। আরও জানা গেল, লাদাখ থেকে হিমাচলের পাহাড়ি এলাকায় এক বিশেষ সমাজের এটাই প্রথা। গুড্ড জানান, এতে তাদের সমাজে একে মেয়ের সংখ্যা কম, তার ওপর সম্পত্তি ভাগ হবে না।

সত্যিই ভারতবর্ষ বড় বিচিত্র দেশ। এখানে এমন গ্রাম আছে যেখানে মেয়েরা বিধবা হয় না। স্বামীর মৃত্যুর পর পরিবারের কোনো না কোনো অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয়ে যায়। আবার এমন গ্রামও আছে যেখানে মেয়েদের একাধিক স্বামী থাকে। নারীবাদীরা নিঃসন্দেহে বহুভর্তৃকা প্রথার অমানবিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন।

ইউনিভার্সিটি-শিক্ষিত শহুরে মানুষ প্রায় সকলেই তুলবেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, রাজোরা তুলবেন না। যদি প্রশ্ন করা হয়, এভাবে থাকতে হয় বলে খারাপ লাগে না? উত্তরে একগাল হেসে বলবেন, 'খারাপ লাগবে কেন? আমার মতন স্বামীর আদর কটা মেয়ে পায়!' ■

## যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

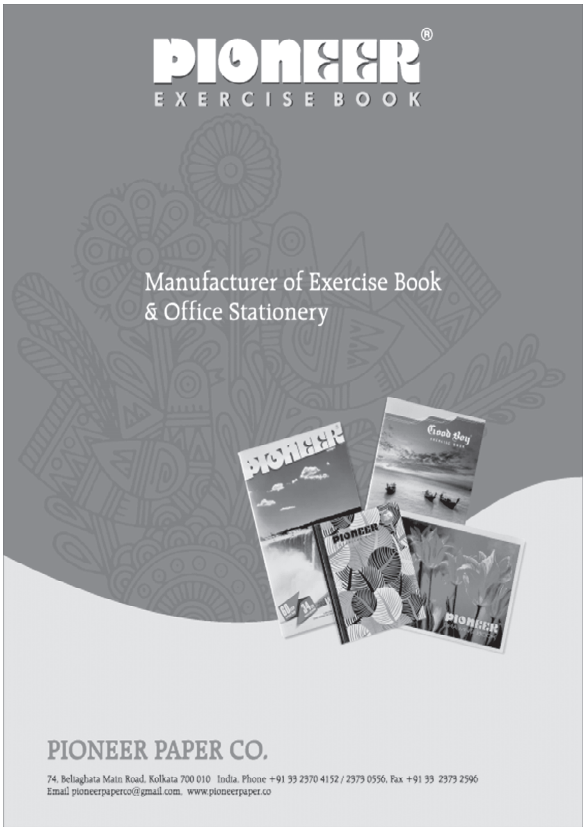



“রোমে চিন্তাশীল ও পণ্ডিত ব্যক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু চিন্তাধারা এবং পাণ্ডিত্যকে সুসংহত করার কথা রোম কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি। তার প্রবল সংস্কার ছিল (সামরিক) শক্তিকে সংহত করার দিকে। অপরপক্ষে যীশুখৃস্ট ছিলেন যেন এশিয়ার মানুষ। আধ্যাত্মিকতা-সহায়ে বিজয়লাভ, যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অপেক্ষা স্নিগ্ধ উজ্জ্বলরূপে শক্তির প্রকাশ, বর্জন অপেক্ষা গ্রহণকে এবং কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানকেই মহত্তর শক্তিরূপে গ্রহণ— এই ছিল তাঁর আদর্শ।”

— *ভগিনী নিবেদিতা*

**সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী**

# মানসিক উদ্বেগ থেকে মুক্তির উপায় যোগনিদ্রা

**আশীষ পাল**

আধুনিক সভ্যতা, উন্নত কারিগরী মানুষকে দিয়েছে অনেক। কিন্তু কেড়ে নিয়েছে সুখ, শান্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা। মানুষ যত দৈহিক আরামের সরঞ্জামগুলি অর্জন করছে, ততই তার মানসিক শান্তি কমে যাচ্ছে। মনের মধ্যে বাসা বাঁধছে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ভয়। দৈহিক সুখ ও বিলাসের প্রবণতা আজ মানুষকে করেছে একা। যৌথ পরিবার ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে নিউক্লিয়ার পরিবার। আজকের দিনে দুটি সন্তান বোঝা বলে ভাবছেন অনেকে।

দৈহিক সুখ ও বিলাসের প্রবল আকর্ষণ থেকে শুরু হয়েছে উদ্বেগ বা টেনশন। আজ এমন পরিবার বা মানুষ পাওয়া খুবই কঠিন, যিনি কোনো না কোনো ভাবে উদ্বেগ বা টেনশান মুক্ত। ছোট ছোট ঘটনা বা কারণগুলিও উদ্বেগ দিচ্ছে পরিবারের সদস্যদের।

আধুনিক বিজ্ঞান টেনশন থেকে মুক্তির অনেক উপায় দিয়েছে। যেমন— মদ্যপান, অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ বা ঘুমের ওষুধ সেবন। কিন্তু এর কুফল আরও মারাত্মক এবং যার ফলেই ভেঙে যাচ্ছে নিউক্লিয়ার পরিবারগুলি।

উন্নত দেশগুলির কাছে আজ এই মানসিক উদ্বেগ হলো সব থেকে বড় সমস্যা। হাজার হাজার ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীর দীর্ঘদিনের গবেষণায় আজ প্রমাণ হয়েছে যে ভারতীয় যোগই দিতে পারে উদ্বেগহীন জীবন।

আসুন, মাত্র ২০ মিনিটের যোগনিদ্রার অভ্যাসে কীভাবে আমাদের শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক উদ্বেগ দূর করে তার অনুশীলন করি।

যোগনিদ্রার জন্য প্রস্তুতি নিন। প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে ভূমির উপর শতরঞ্চি বা কম্বল বিছিয়ে বসুন। এবার প্রার্থনার জন্য সুখাসন, বজ্রাসন বা পদ্মাসনে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসুন। চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ করুন। গর্দান ঢিলে ছেড়ে দিন। কাঁধ পিঠ, বুক, হাত, কোমর, পায়ের মাংসপেশি আলগা করে দিন। মুখে স্মিত হাসি। শান্তভাবে বসে গভীর শ্বাস নেওয়া শুরু করুন। এবার যোগনিদ্রার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিন। শুরুতে সংকল্প করুন— জীবনে আপনি যে রকম পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা করেন সেই রকম ছোট এবং স্পষ্ট সংকল্প করুন। যোগনিদ্রার সময় যে সংকল্প করা যায় তা অবশ্যই পূরণ হয়। যোগিনিদ্রা করার সময় চোখ বন্ধ রাখতে হবে এবং চোখ খুলতে বলা হলেই খুলবেন। মন সক্রিয় রেখে এই প্রক্রিয়াতে অংশ নিতে হবে। যে সব নির্দেশ আসবে সেগুলো মনোযোগ সহকারে শুনতে শুনতে সজাগভাবে ওই নির্দেশগুলি পালন করবেন। কোনো রকম বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আপনি মানসিক ভাবে বিশ্রামের সুযোগ পাবেন না। মনের মধ্যে কোনো রকম চিন্তার উদয় হলে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। এইবার ওম্ উচ্চারণ করার জন্য বুক ভরে শ্বাস নিন। অ-উ-ম—

তারপর প্রার্থনা করুন—

**লয়ে সম্বোধয়ে চিত্তং, বিক্ষিপ্তং সময়েৎ পুনঃ।**
**সকষায়ং বিজানীয়াৎ, সম্প্রাপ্তং ন চালয়েৎ।।**

অর্থাৎ ধ্যানের সময় মন নিদ্রিত হতে থাকে তাকে জাগিয়ে রাখুন। মন যদি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় তাহলে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। মনের ভিতর যদি কুচিন্তা আসে তাহলে মন স্থির হওয়া পর্যন্ত বিচলিত হবেন না। এবার নমস্কার স্থিতিতে সামনে ঝুঁকে ঈশ্বরকে প্রণাম করুন, ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসুন। মন

শান্ত রাখুন। এবার শান্তি বজায় রেখে দ্রুত শবাসনের জন্য পিঠের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ুন। পায়ের পাতা জোড়া রাখুন। হাত শরীরের সঙ্গে জুড়ে রাখুন। শরীর লম্বা করে টান টান করার চেষ্টা করুন। সমস্ত গ্রন্থি টান টান করে শরীর লম্বা করুন। মেরুদণ্ড টান করে লম্বা করার চেষ্টা করুন। দুই হাত টেনে লম্বা করুন। আঙ্গুলগুলো সোজা করুন। গোড়ালি সোজা করে টান রাখুন। পায়ের আঙ্গুলগুলোও টেনে রাখুন। সমগ্র শরীরে কম্পন অনুভূত হওয়া উচিত। অনুভব না হলে আরো টান টান রাখুন। শেষে একবার পুরো শ্বাস নিয়ে শরীর টেনে আরও লম্বা করুন। এবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সম্পূর্ণ শরীর শিথিল করুন। দুই গোড়ালির মাঝখানে একফুট ফাঁক রাখুন। দুটি হাত শরীর থেকে কিছু দূরে রাখুন। হাতের তালু বা চেটো আকাশের দিকে রাখুন। পা এবং উরুসন্ধি হাল্কা করুন। হাত দুটিও কাঁধ থেকে আল্‌গা করুন। মেরুদণ্ডের হাড় সমস্ত গ্রন্থি থেকে আলগা করে দিন। গর্দান সোজা ও আলগা রাখুন।
চোখ-গলা-ঠোঁট এবং চেয়াল আলগা করে দিন। এখন আপনার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের শিথিলতা অনুভব করুন।

পায়ের বুড়ো আঙ্গুল এবং অন্য আঙ্গুলগুলি শিথিল হচ্ছে। মালাইচাকি এবং জঙ্ঘার উপরিভাগ, জঙ্ঘার নীচের অংশ এগুলো সব শিথিল হয়ে গেছে। নাভির নীচে সম্পূর্ণ অংশ শিথিল। কম্পন অনুভব করুন। এই কম্পনের কারণে নাভির নীচে সমস্ত অঙ্গের ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে এই রকম অনুভব করুন। দীর্ঘশ্বাস নিন এবং ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন।

এবার আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ পেটের উপর রাখুন। পেট এবং পিঠের, পাঁজরের আশপাশের মাংসপেশী শিথিল হচ্ছে। আপনার মেরুদণ্ডের হাড়ের সমস্ত জোড়া নীচের থেকে উপরের দিকে এক এক করে আলগা করুন এবং শিথিলতা অনুভব করুন। কাঁধ, বুক, বুকের পাঁজর এবং এর সঙ্গে জড়ানো মাংসপেশীগুলি এক এক করে শিথিল হচ্ছে—অনুভব করুন এইগুলি শিথিল হয়ে গেছে। হৃদয়ের শব্দ স্বাভাবিক হয়েছে। শ্বাসের গতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কাঁধের দু'দিক শিথিল করুন। দুই হাতের আঙ্গুল, মণিবন্ধ, হাতের কনুই শিথিল হচ্ছে। শরীরের নাভিমণ্ডলের উপর থেকে কাঁধ পর্যন্ত শিথিল হয়ে গেছে। এখন উ-কার উচ্চারণ করার সময় শরীরের মধ্যভাগে কম্পন অনুভব করুন। এই কম্পনের কারণে শরীরের মধ্যভাগের গভীর বিশ্রাম হচ্ছে— এই রকম অনুভব করুন। গভীর শ্বাস নিন এবং ধীরে শ্বাস ছাড়ুন।

এবার আপনার মনোযোগ শরীরের উপরিভাগে নিয়ে আনুন। আপনার ঘাড় বা গর্দানের চারিদিকের মাংসপেশী আলগা করুন। আপনার এইভাগের সমস্ত মাংসপেশী শিথিল করুন। আপনার দুটি ঠোঁট আলগা করুন। নাক-চোখ ধীরে ধীরে শিথিল করুন। গাল, কাঁধ, কপাল থেকে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে অনুভব করুন। মাথার উপরিভাগ এবং আপনার মাথার যে অংশ মাটি স্পর্শ করে আছে, তার ডান দিক এবং বামদিক ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। কাঁধের উপরিভাগ সম্পূর্ণ আলগা হয়ে গেছে। পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় এসেছে। এই সময় ম-কারের উচ্চারণ করুন। গভীর শ্বাস নিয়ে ম উচ্চারণ করুন যাতে মস্তিষ্কের কোষগুলি বিশ্রাম পায়। আবার সমস্ত শরীরের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন। সর্ব অঙ্গ শিথিল করুন। গভীর শ্বাস সহযোগে ওম্ উচ্চারণ করুন এবং সংকল্প স্মরণ করুন। যে সংকল্প আপনি যোগনিদ্রা শুরু করার সময় করেছেন। এই সংকল্প আন্তরিকভাবে তিনবার করুন। এবার আপনার শ্বাসের উপর মনোযোগ দিন। শ্বাস নেবার সময় ঠাণ্ডা বায়ু ভেতরে যাচ্ছে। তাই শরীরে নতুন চেতনা তৈরি হচ্ছে। শ্বাস ছাড়ার পর নাক থেকে গরম হাওয়া বের হতে থাকছে। এই কারণে শরীরের প্রত্যেক অংশ থেকে দুর্বলতা, ক্লান্তি নেতিবাচক চিন্তা বাইরে বেরিয়ে আসছে। আবার শ্বাস নিলে শরীর পুনরায় চেতনা এবং উৎসাহ ফিরে পাচ্ছে। এবার আপনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সজাগ থাকার প্রয়াস করুন। শরীর স্পর্শ করছে যে বায়ু তার প্রতি সজাগ থাকুন। তা অনুভব করার চেষ্টা করুন। মন অতিরিক্ত সক্রিয় করার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র যা হচ্ছে যা ঘটছে তা সহজ ভাবে অনুভব করতে থাকুন। এখন মনোযোগ নাভি মণ্ডলের উপর কেন্দ্রীভূত করুন। শ্বাস নেওয়ার সময় নাভি ও উদরের বহিরাঙ্গ ফুলে ওঠে। শ্বাস ছাড়ার সময় নাভি এবং উদর সংকুচিত হয়ে যায়। এইভাবে ১ থেকে ১৮ গুনে এই ক্রিয়াটি করুন। পরে ১৮, ১৮, ১৭, ১৭, ১৬, ১৬— গুনতে গুনতে ১ সংখ্যায় ফিরে যান। এবার আপনার ডান হাত ভূমি থেকে সরিয়ে মাথার কাছে নিয়ে যান। বাঁ পায়ের হাঁটু মুড়ে রাখুন। ডান দিক ফিরে শোবার ভঙ্গিতে আসুন। চোখ বন্ধ অবস্থায় ধীরে ধীরে প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসুন। নমস্কার মুদ্রায় কল্যাণমন্ত্র উচ্চারণ করুন—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ
দুঃখভাগভবেৎ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

দুই হাত শরীরের পেছনের দিকে আনুন। ডান হাত দিয়ে বাম হাতের মণিবন্ধ ধরুন। শ্বাস ছেড়ে মাথা মাটি স্পর্শ করে প্রণাম করুন। ধীরে ধীরে দুই হাত জোড়া করে ঘষতে থাকুন এবং হাতের চেটো দুটি খোলা রেখে চোখের উপর আলতো ভাবে স্পর্শ করুন। হাত সরিয়ে নিন। ধীরে ধীরে চোখ খুলুন। বলুন— হরি ওঁ তৎ সৎ।

*(লেখক একজন যোগবিশেষজ্ঞ)*

সমাবেশ সমাচার

# মেমারীতে সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শন অনুষ্ঠান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (পরিবার প্রবোধনের) অনুপ্রেরণায় ও উদ্যোগে মেমারীর প্রবীণ নাগরিক বিজয় কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শনের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে ২৫ জন সঙ্ঘপ্রেমী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন পরিবার প্রবোধনের প্রান্তপ্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র, প্রান্তটোলীর সদস্য ওমপ্রকাশ রাওয়াত, বিভাগ কার্যাবাহ প্রদীপ চৌধুরী প্রমুখ। বিজয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, মহাদেব বিষয়ী, শিবপূজন ভকত ও শিবরাম মোদককে মালা, উত্তরীয়, নারকেল ও মিষ্টি প্রদান করে সম্মান জানান দেবপ্রসাদ সরকার, নিহারেন্দু ভট্টাচার্য, কার্তিক মণ্ডল ও গণেশ ভকত।

প্রথমে অনুষ্ঠানের সারমর্ম তুলে ধরেন পরিবার প্রবোধনের প্রান্তপ্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র। প্রান্তটোলীর সদস্য শ্রীরাওয়াত সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে সবাইকে চা ও মিষ্টি পরিবেশন করা হয়।

# গুরুগোবিন্দ সিংহের ৩৫০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনাসভা

গত ২৭ নভেম্বর শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে কলকাতার মহাজাতি সদনের অ্যানেক্সে গুরুগোবিন্দ সিংহের ৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'বর্তমান পরিস্থিতিতে গুরু গোবিন্দ সিংহ এবং তাঁর রাষ্ট্রবাদ' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধানবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় শিখ সঙ্গতের অধ্যক্ষ এবং রাজস্থান সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল সর্দার গুরুচরণ সিংহ গিল। তিনি বলেন, অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য গুরুগোবিন্দ সিংহ দেশের সাধারণ মানুষকে তৈরি করেছিলেন। তিনি ক্ষাত্রধর্মের সঙ্গে শাস্ত্রধর্মের মিলন ঘটিয়েছিলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিমল লাট। অনুষ্ঠানের শুরুতে অরুণ 'মল্লাবত নিকলতী সাস বোলেগী, হাজারো বার বোলেগী, হমারে দেশ কী জয় হো, শ্রীগুরুগ্রন্থ কী জয় হো' গীত পরিবেশন করেন। মঞ্চাসীন অতিথিদের মাল্যার্পণ করেন গজানন্দ রাঠী, শান্তিলাল জৈন এবং সত্যেন্দ্র সিংহ অটল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যোগেশরাজ উপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

## শোকসংবাদ

পুরুলিয়া জেলার ভবানীপুর শাখার স্বয়ংসেবক সুরজিত মাহাতর বাবা মুলুকচাঁদ মাহাত গত ২৭ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি নাতনিদের রেখে গেছেন।

# চুঁচুড়ায় সঙ্ঘের হুগলী জেলা কার্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন

গত ৩০ নভেম্বর হুগলী জেলায় চুঁচুড়ায় সমাজ সেবা ভারতীর উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন সম্পন্ন হয়। অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য মধুভাই কুলকার্ণি ও প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত পূজা ও হোমের পর নারকেল ফাটিয়ে দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, পূর্বক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখ রমাপদ পাল, প্রবীণ প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বস্তিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী, সহপ্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়-সহ নবীন ও প্রবীণ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের কার্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন মধুভাইজী। অনুষ্ঠানে কার্যালয় নির্মাণে বিশেষভাবে অগ্রণী চারজন কার্যকর্তাকে অভিনন্দিত করা হয়। শেষ প্রায় এক হাজার জন সহভোজে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, নবনির্মিত ভবনের নাম 'বন্দে মাতরম্ ভবন'।

---

# কলিগ্রাম সমাজসেবা ভারতীর পক্ষ থেকে সাহায্যদান

গত ৪ ডিসেম্বর রবিবার বিকাল ৪টায় কলিগ্রাম সরস্বতী শিশুমন্দিরের কলিগ্রাম 'সেবাভারতী'র উদ্যোগে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের প্রবীণ সদস্য সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী। গত ১৫ অক্টোবর মৌলবাদী দুষ্কৃতীদের আক্রমণে কলিগ্রামের মহারাজতলা-সহ কলিগ্রামের প্রায় কুড়িটি বাড়ি, একটি ওষুধের দোকান, দুটি জুয়েলারি দোকান, একটি ট্রাক, একটি পিক্‌আপ ভ্যান, দুটি অ্যাম্বাসাডর গাড়ি, দুটি টোটো গাড়ি ও কয়েকটি আইসক্রিমের গাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট হয়। দুটি বাড়ি ও একটি ট্রাক আগুনে ভস্মীভূত করে। কয়েকটি গোরু চুরি করে নিয়ে যায়। ইন্দ্রদেব মহারাজ মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর করে। আক্রান্তরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের। গাড়ির ড্রাইভারের কাজ করে, দোকান চালিয়ে, মাছ ধরে, দুধ বিক্রি করে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করে। আক্রান্তদের জন্য ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এলাকার মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন করা হয়েছিল। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে কিছু অর্থ জমা হয়। সেদিন সেই অর্থ আক্রান্ত দরিদ্র অসহায় পরিবারের হাতে সহমর্মিতার সঙ্গে তুলে দেওয়া হয়।

---

# প্রবীণ নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

গত ২০ নভেম্বর বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার ধরমপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে অশীতিপর প্রবীণ নাগরিকদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে ৫ জন প্রবীণ নাগরিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয় যাঁদের বয়স ৮৪ থেকে ৯৫ বছরের মধ্যে। প্রথমে বাড়ির সদস্যরা তাঁদের চরণ ধৌত করে ধূপ, দীপ, ধান, দুর্বা ও চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করেন। তারপর পরিবার প্রবোধন ও স্থানীয় সদস্যদের পক্ষ থেকে উত্তরীয়, গীতা, ধুতি, কম্বল, ছাতা, মাফলার ও ফল মিষ্টি দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র, সদস্য সুতনু সাঁতরা, জেলা প্রমুখ রণজিৎ বসাক এবং দক্ষিণবঙ্গের সঙ্ঘচালক অতুল চন্দ্র বিশ্বাস। পরিবার প্রবোধনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনজনই মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রবোধনের প্রান্ত টোলীর সদস্য বিনয় ভূষণ দাস।

# ডাকটিকিটে বিশ্বদাবার খেতাবি লড়াই

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যাগসাস কার্লসেন

গ্যারি কাসপারভ

নরওয়ের বিস্ময়কর প্রতিভা ম্যাগনাস কার্লসেন আবার বিশ্বদাবার খেতাবি লড়াইয়ে জিতে নিজের সাম্রাজ্য অটুট রাখলেন। নিউইয়র্কের ইউ এন ট্রেড সেন্টারের সর্বোচ্চ তলে ১২ গেমের লড়াইয়ে রাশিয়ার সেগেই কারকিয়াকিনকে সরাসরি হারাতে পারেননি অবশ্য কার্লসেন। লড়াই গড়ায় ট্রাইব্রেকার পর্যন্ত। র‍্যাপিড দাবায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ কার্লসেন অবিশ্বাস্য সব চাল দিয়ে শেষপর্যন্ত পর্যুদস্ত করেন সেগেইকে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ট্রাইবেকারের গেম তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন ভিআইপি এনক্লোজারে বসে। তার আশা ছিল রাশিয়ার দাবার হারানো ঐতিহ্য ও গরিমা ফিরিয়ে আনবেন সেগেই। কিন্তু তার বিপক্ষে যে অন্য কেউ ছিলেন না, ছিলেন আন্তর্জাতিক প্রতিভার অধিকারী ম্যাগনাস কার্লসেন। ২৬তম জন্মদিনের দিন তৃতীয়বারের জন্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ম্যাগনাস বুঝিয়ে দিলেন ববি ফিশার, গ্যারি কাসপারভ, বিশ্বনাথন আনন্দের পাশাপাশি বিশ্বদাবার 'হল অব ফেমে' এবার তার অন্তভুক্তি শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র। এই বিশ্বদাবাকে ঘিরে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য ডাকটিকিট। চিরস্মরণীয় সব ম্যাচকে ধরে রাখা হয়েছে এই সব ডাকটিকিটে। ১৯৭২-য়ে আইসল্যান্ডের রোকিয়াভিকে ববি ফিশার বনাম ববিস স্প্যাসকির খেতাবি লড়াইটি অন্য মাত্রা পেয়ে গেছিল তৎকালীন দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের অবতারণায়। দু'দেশের ডাক বিভাগ প্রকাশ করেছিল বেশ কয়েকটি ডাকটিকিট। তাতে দাবাকে কেন্দ্র করে উঠে আসে আমেরিকা ও সোভিয়েতের আর্থসামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক ইতিহাস। গোটা দুনিয়ায় সেই লড়াইকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। বিশ্বের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচিত হয়ে যায় আইসল্যান্ডে। যদিও দাবা খেলাকে কেন্দ্র করে প্রথম ডাক টিকিট প্রকাশ করে বুলগেরিয়া ১৯৪৮ সালে। সেবছর সেদেশে অনুষ্ঠিত চারদেশীয় টুর্নামেন্ট উপলক্ষে ৯ লেডা মূল্যের ওই টিকিটটি বাজারে ছাড়া হয়। টিকিটে ছিল একটি ঘোড়ার মুখের ছবি। ওই টুর্নামেন্ট চলার সময় সোভিয়েত রাশিয়া প্রকাশ করেছিল তিনটি স্মারক টিকিট।

১৯৫০-য়ে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত প্রথম ক্যান্ডিডেটস দাবা উপলক্ষে দু'সেট টিকিট প্রকাশ করেছিল হাঙ্গেরি। এই সবকটি টিকিটিই এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৯২৭-য়ে কিউবার কাপাব্ল্যাঙ্কা বিশ্বদাবার খেতাব জিতেছিলেন আলেকজান্ডার আলেখিনকে হারিয়ে। তার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবার ২৫ বছর উপলক্ষে কিউবা ১৯৫২ সালে ৭টি টিকিটের একটি সেট প্রকাশ করে। এই কিউবা থেকেই ১৯৬৬ সালে প্রকাশ পেয়েছিল ৬টি টিকিটের আরো একটি সেট। উপলক্ষ্য ছিল বারিস স্প্যাসকি ও তাইগ্রান পেত্রোসিয়ানের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াই। ১৯২৪ সাল থেকে শুরু হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল টিম চ্যাম্পিয়নশিপ। আন্তর্জাতিক দাবা জগতে যা 'চেস অলিম্পিক্স' নামে অভিহিত।

এই উপলক্ষে ১৯৫০ সাল থেকে বিভিন্ন দেশ ডাকটিকিট প্রকাশ করে আসছে। প্রথমবার দাবা অলিম্পিক্সকে ডাক টিকিটের মাধ্যমে তুলে ধরে মার্শাল টিটো-র যুগোশ্লাভিয়া। ইউরোপে যুগোশ্লাভিয়া সে সময় যথেষ্ট উন্নত একটি রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হোত। মার্শাল টিটো নিজেও যথেষ্ট ভালো দাবা খেলতেন। দেশটিকে গড়েপিঠে নিয়েছিলেন নানাবিধ সংস্কার করে। আর দাবা প্রেমের জন্যই প্রতিটি দাবা অলিম্পিকসে হাজির থেকেছেন।

আরবে বহু প্রাচীনকাল থেকে দাবার প্রচলন ছিল। ডাকটিকিটে প্রাচীন গুহা চিত্রকলায় দাবা খেলার ছবিই তার প্রমাণ। দাবা খেলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন ইংরেজ তাত্ত্বিক লেখক ও প্রকাশক উইলিয়াম ক্যাক্সটন ১৪৭৬ সালে। এই গ্রন্থ প্রকাশের ৫০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গ্রেট বৃটেন ৪টি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ব্যক্তিগত বিশ্বজয়ীদের নিয়েও বেশ কয়েকটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৪ সালে রাশিয়ার সম্রাট জার দ্বিতীয় নিকোলাস তিনি নিজেও প্রথম শ্রেণীর দাবা খেলোয়াড় ছিলেন, আয়োজন করেছিলেন এক আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা। বিশ্বের সব উন্নত দেশের নামি দাবাড়ুরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। অসাধারণ সেই প্রতিযোগিতার জয়ী হয়েছিলেন সর্বকালের সেরা চ্যাম্পিয়ন গ্রান্ডমাস্টার সুইজারল্যান্ডের ইমানুয়েল লাসকার। তার চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব সংবলিত একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স। এছাড়া মার্কিন সুপার গ্রান্ডমাস্টার তথা অন্য গ্রহের দাবাড়ু বলে স্বীকৃত ববি ফিশার বিশ্বখেতাব জেতার পর তাকে নিয়ে স্বদেশে-বিদেশে ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছিল। উত্তর আধুনিক যুগের কাসপারভ, গাতা কামাস্কি এবং হালের চ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেনের বিভিন্ন বিশ্বখেতাবি খেলার স্মরণীয় মুহূর্তকে ধরে রাখা আছে নানা দেশের ডাকটিকিটে। ■

**শব্দরূপ-৮১৩** ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

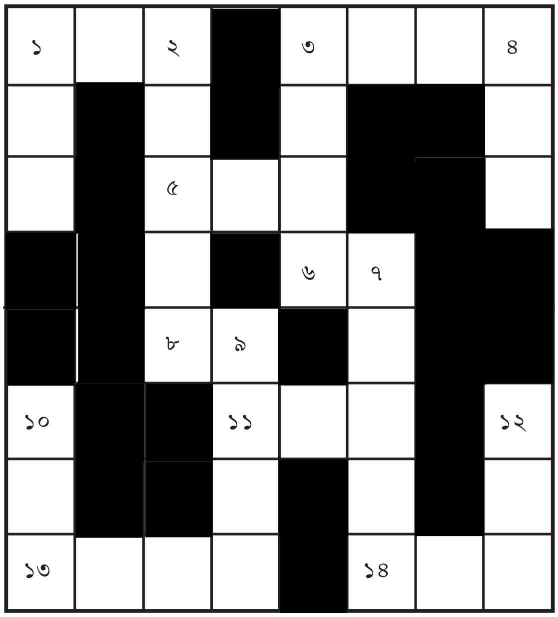

## সূত্র :

**পাশাপাশি :** **১.** ভঙ্গুর, **৩.** বেদবিভাগ-কর্তা ঋষি, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, **৫.** জাগতিক, ঐহিক, **৬.** কুল তট, **৮.** লজ্জার খই! **১১.** মহামারী, **১৩.** ক্ষুধা; ক্ষুধার তাড়না, **১৪.** বৈদ্যকশাস্ত্রকার বিশেষ ('—সংহিতা')।

**উপর-নীচ :** **১.** বোধিসত্ত্বের একটি নাম; বর্তমান ভারতে প্রবর্তিত একটি সরকারি উপাধি, **২.** যে বিনা বিচারে অন্যের নামে লাগানি শোনে, **৩.** রাবণের দ্বারা উৎপীড়িত রামায়ণোক্তা সতী, যিনি পরজন্মে সীতারূপে আবির্ভূতা হন, **৪.** মনসামঙ্গলকাব্যে চাঁদসদাগরের পত্নী, **৭.** বিপদ আপদ হতে রক্ষা পাবার জন্য হস্তধৃত তাবিজ, **৯.** পরশুরামের পিতা, **১০.** নীচজাতি, **১২.** পাপ ('মহা—')।

**সমাধান শব্দরূপ-৮১০**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ম | ং | পু | | রা | জ | রা | জ |
| চ্ছ | | ন | | ম | | | য় |
| ব | | রু | মা | লী | | | ন্ত |
| | | থা | | লা | খ | | |
| | | ন | ল | | ব | | |
| ম | | | বে | গা | র | | ব |
| থু | | | জা | | দা | | য় |
| রা | জ | স্থা | ন | | র | হ | স্য |

**সঠিক উত্তরদাতা**

**সুশীল কয়াল**
**কলকাতা-৬**
**সোমেন নাগ**
**বড়কালীতলা, বাঁকুড়া**

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।*
*খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

☐ ৮১৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ২ জানুয়ারি ২০১৭ সংখ্যায়

# প্রেরণার পাথেয়

পরিস্থিতি শোধরানোর জন্য দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন উভয় পন্থার প্রয়োজন। মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো উৎপাদন হ্রাস এবং বর্ধিত অনুৎপাদক ব্যয়পূর্তির জন্য সরকারের নতুন নতুন ঋণ সৃষ্টির কারণে টাকার মূল্যের অবনমন। কেবলমাত্র চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার হিসেব ভিন্নভাবে করা নয়, বরং তার ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য তৃতীয় যোজনারও পুনর্রূপ দেওয়া প্রয়োজন। সরকারি ব্যয়ে উপযুক্ত মাত্রায় অর্থ রাখতে হবে এবং প্রয়োজনহীন যোজনাগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়িয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমদানির মাধ্যমে উপভোক্তার চাহিদা পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন।

* * *

'লাঙ্গল যার জমি তার' কথার অর্থ কখনই নয়, যে চাষ করে সে জমির মালিক এবং সে অন্যের জমি চাষ করে লাভ নিতে পারবে না। প্রয়োজন অনুসারে তার পরিশ্রম করার অধিকার থাকতে হবে, অন্যথায় কৃষিকাজ লাটে উঠে যাবে। 'লাঙ্গল যার' কথার সাধারণ অর্থ হতে পারে, জমির ভালমন্দের দায়িত্ব তার থাকবে এবং নিজে জমি দেখাশুনা করবে। কতটা নিজে করবে, কতটা শ্রমিক দিয়ে করাবে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

* * *

এটা তর্কাতীত ভাবে বলা যায় যে, এত কম জমি নির্ধারণ করা শুধু আর্থিক নয়, অন্যান্য কারণেও সমীচীন হতে পারে না। কৃষিকাজ মধ্যমশ্রেণীর লোকরাই সব সময় করে এসেছে। আমরা যদি কৃষকদের মধ্য থেকে এই শ্রেণী নষ্ট করে ফেলি, তাহলে ভারতের মতো কৃষকবহুল দেশে গণতন্ত্র ঠিকভাবে চলতে পারে না। শহর ও গ্রামে খরচের ভিন্নতার কারণে আয়ের অন্তর বোঝা যায়, কিন্তু এত বেশি অন্তর কখনোই ন্যায্য বলে মনে হতে পারে না। কৃষিকাজের উন্নতির দৃষ্টিতে গ্রামে এমন এক শ্রেণী থাকা প্রয়োজন যারা একটু সাহস করে নতুন নতুন প্রয়োগ করতে পারে। বেশি জমির মালিকরা এই প্রচেষ্টা করে না। সেজন্য ভাল মধ্যমশ্রেণী থাকলে তারা কৃষকদের জন্য 'মডেল ফার্ম' তৈরি করে দেখানোর ক্ষমতা রাখবে। সরকারি সাহায্য ও প্রচার ছাড়া এ সম্ভব নয়।

***(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)***

## ।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ১৫

## আচার্য-আচার্যা চাই (শিক্ষক, শিক্ষিকা)

প্রস্তাবিত বিদ্যালয় ভবন

একটি সেবামূলক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০১৭-তে শুরু হচ্ছে। এর জন্য ৩ জন আচার্য-আচার্যা প্রয়োজন।

একজন — B. Sc / M. Sc, B. Ed, (Pure Science)

একজন — B. A / M. A, B. Ed, (English)

একজন — B. P. Ed (Physical Education)

আগ্রহী ব্যক্তিদের আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে জীবনপঞ্জী-সহ (বায়োডাটা) দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

## সরস্বতী বিদ্যা মন্দির

গ্রাম - তাঁতিবেড়িয়া, ডাক - কুশবেড়িয়া, থানা - উলুবেড়িয়া
জেলা - হাওড়া, পিনকোড নং - ৭১১ ৩১৬

# ভারতীয় কন্যার বিশ্বজয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ বয়েস মাত্র ১৬। কিন্তু তাতে কী! এই বয়েসেই ভারতীয় পরিবেশবিদ কেকাশন বসু জিতে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার। বর্তমানে আরব আমিরশাহিতে বসবাসরত কেকাশনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মহম্মদ ইউনুস। কেকাশনের যখন মাত্র ৮ বছর তখন থেকেই সে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। পুরস্কারদাতা সংস্থা কিউসরাইট-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ৮ বছর বয়েসেই সে নিজের হাতে প্রথম বৃক্ষরোপণ করে। ১২ বছর বয়েসে তৈরি করে নিজের সংস্থা গ্রিনহোপ। বস্তুত এই সংস্থার মাধ্যমেই সে এতদিন স্বচ্ছতার কার্যক্রমগুলি পরিচালনা করেছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জও তাদের পরিবেশ রক্ষা কার্যক্রমের প্রচারদূত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কেকাশনকে। তার হাতে পুরস্কার তুলে নিয়ে মহম্মদ ইউনুস বলেন, ‘শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্য সুস্থ পরিবেশ একান্ত জরুরি। একে শিশুদের মৌলিক অধিকারও বলা যেতে পারে। কেকাশন আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে সুস্থ পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সবাই মিলে এগিয়ে না এলে পরিবেশ বাঁচবে না।’

# আত্মরক্ষায় নৌসেনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি**॥ চীনা নৌবাহিনীর হাঁড়িতে কী ফুটছে তার সব খবর ভারত রাখে। সেই মতো প্রস্তুতিও নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল চিফ সুনীল লাম্বা বলেন, ‘আমরা চীনের যুদ্ধজাহাজ সাবমেরিন এবং পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ওপর কড়া নজর রাখছি। ভারত মহাসাগরে চীনের গতিবিধিও আমাদের নজরে আছে।’ সম্প্রতি চীন পাকিস্তানে গোয়াদর বন্দরে একাধিক যুদ্ধজাহাজ এবং সাবমেরিন একত্রিত করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাডমিরাল চিফের ওই মন্তব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের কাছে এখন ১৩৮টি যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। যার মধ্যে আছে ৪৮টি পারমাণবিক যুদ্ধে সক্ষম বড়ো যুদ্ধজাহাজ ও ১৪টি সাবমেরিন। ২০২৭ সালের মধ্যে আরও ২১২টি যুদ্ধজাহাজ এবং ৪৫৮টি যুদ্ধবিমান তৈরি হয়ে যাবে। তৈরি হয়ে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছে আই এন এস বিক্রান্ত, শিবালিক, স্করপিয়ন সাবমেরিন, পারমাণবিক যুদ্ধে সক্ষম সাবমেরিনও।


বঙ্গে ৩০
১৯৮৭-২০১৬

**SAMSKAR BHARATI PASCHIMBANGA**
**(DAKSHINBANGA)**

30th Year Celebration
**Nritya Sandhya**

সংস্কার ভারতী
ললিতকলা ও সাহিত্যে
সমর্পিত
অখিল ভারতীয় সংস্থা

**INVITATION**

**Friday 16th December, 2016 ● 5.35 p.m.**

**MAHAJATI SADAN**
**(Beside M. G. Road Metro Station)**

Inaugurator :
**Smt. Alokananda Roy**

Special Guests :
**Smt. Amita Dutta**
**Sri Kohinoor Sen Barat**

President :
**Sri Victor Banerjee**
**(Chairman, Swagat Samiti)**

- **OPENING DANCE :**
  **Presented by**—Suri Shakha
  **Directed by**—Moumita Bishnu Sengupta
- **NABARASE SRI KRISHNA :**
  **Presented by**—Pratibha
  **Directed by**—Sanjukta Sengupta
- **MEGHNAD BADH KABYA**
  **Presented by**—Gaudiya Nritya Bharati
  **Directed by**—Dr. Mahuya Mukhopadhyay

**Open to All**

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
12 December - 2016 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com।। দাম ১০ টাকা।।